কন্যাদান

বিমল মিত্র

কমলা সাহিত্য মন্দির
কলিকাতা-৩৪

প্রকাশিকা :—
রিতা চক্রবর্ত্তী
কলিকাতা-৩৪

প্রথম প্রকাশ :—
শুভ ১লা বৈশাখ, ১৩৭২

মুদ্রক
শ্রীশরৎচন্দ্র প্রধান
মহাপ্রভু প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১২, বিনোদ সাহা লেন
কলিকাতা-৬

উপহার

এক

দুর্ঘটনা কখনো আগে সাবধান করে আসে না। তাই হয়েছিল ওদের জীবনেও। দ্বিতীয় কবরটার ওপর আলগা মাটি গুলোকে দিয়ে চেপে চেপে সমান করা হলো। অসীতের প্রথম কাজ শেষ হলো। টলতে টলতে তারপর সে গিয়ে দাঁড়ালো উড়োজাহাজটার কাছাকাছি।

বিরাট গহনবন। তার মধ্যে এইটুকুমাত্র ফাঁকা জায়গা। বিঘে-দুয়েক হবে বড় জোর। তাই সীমানা ঘেঁষে ডাকোটা-প্লেনটা ভেঙে তুব্‌ড়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে আকাশছোঁয়া দৈত্যের মতন বিরাট গাছটার গোড়ায়।

গাছটার বিশেষ নামটা অসীত জানে না। ওরা বলে-"বন-দত্যি"। অসীতের মনে পড়ল, দক্ষিণ আমেরিকায় একরকম বিরাট গাছের কথা সে শুনেছে কিংবা পড়েছে যেন কোথায়। নাম তার "জায়ানট্‌-হেড"। সেই গাছই নয়তো? কে জানে? হবেও বা।

জোর করে মন থেকে ভাবনাটা ঝেড়ে ফেলে দিলে অসীত। এসব উদ্ভিদতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই তার এখন। গাছটা গাছই। তবে এমনি গাছকেই বোধ হয় 'বনস্পতি' বলতে হয়।

ঐ 'বন-দত্যি'-টার মাথার সংগেই ঠক্কর খেয়েছে উড়োজাহাজটা। টিনের খেলনার মতন ক্রু-কেবিনটা তাল-তোবড়া হয়ে গেছে।

প্রাকৃতিক দত্যির সংগে মহড়া দিতে গিয়ে হার মেনেছে যন্ত্র দত্যিটা। অপমৃত্যু ঘটেছে তার।

অপমৃত্যু ঘটেছে ভেতরের (ক্রু) পাইলট্ দুজনেরই। চিপটে থেৎলে মরে গেছে সংগে সংগেই। রক্তে ভেসে গেছে কেবিনের ভেতরটা। সে রক্ত বাইরেও গড়িয়ে আসছে ভাঙা দরজার মুক্ত পথে।

লাশদুটোকে টেনে হিঁছড়ে বার করতে গলদঘর্ম হয়ে গেছে অসীত।

মৃত্যু দেখেছে অসীত ঘোষ। দেখেছে সে অপমৃত্যু। গুলি ছোড়ায় মৃত্যুর দৃশ্য তার কাছে নতুন কিছু নয়। এমন বীভৎস অপমৃত্যু সে কিন্তু আর দেখেনি। এখনও মাথা ঝিমঝিম করছে। বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা এখনও থামেনি। এখনও তো অনেক বাকি।

তবু যাহোক, দু-দুটো বীভৎস লাশকে গোর দেওয়া সাঙ্গ হলো এতক্ষণে।

গরমও তেমনি। অসহ্য, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

দুর্ঘটনাটার পর থেকে এতক্ষণে একটু হাঁফ ছাড়ার অবকাশ পেলো অসীত।

অন্যমনস্ক ভাবে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে মোটা একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো সে। মনে হতে লাগল দাঁড়াতে পারবে না। ক্লান্তি অবসাদ, আর দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় যেন ভেঙে ভেঙে এলিয়ে পড়তে যাচ্ছিলো তার সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা ইস্পাত দেহটা।

কিন্তু নাঃ, ভেঙে পড়লে অসীতের চলবে না। অসীত যুঝবে, লড়বে। যতক্ষণ পারবে, ভয়ঙ্করের সংগে সে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাঞ্জা লড়বে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডাকোটাখানার দুর্দশা দেখতে দেখতে

আপনমনে ভেবে চললো অসীত। বিচিত্র সেই ভাবনা। হয়তো হাস্যকর। হয়তো ছেলেমানুষী।

মানুষ উঠেছে বিজ্ঞান-সভ্যতার অভাবনীয় শিখরে। দম্ভের তার অন্ত নেই। দুনিয়াটাকে সে জয় করতে চাইছে, একটা মাত্র বোমায় সে মাটির স্বর্গকে জাহান্নামে পাঠাবার হুমকি ছাড়ছে। দুনিয়া তুচ্ছ। আকাশকে পেয়েছে হাতের মুঠোয়, ছুটছে সে অসীম নীলিমা থেকে গ্রহ তারা গুলোকে ছিনিয়া নিতে।

আকাশের দেবতার মাহাত্ম্যকে খর্ব করতে চলেছে মানুষ তার হাতের তৈরী দত্যিদের লেলিয়ে দিয়ে। কিন্তু···মানুষেরই অতিবৃদ্ধ পিতামহরা লিখে গিয়েছিলেন, সেকালের দত্যিরাও নাকি দম্ভভরে বারবার ত্রিভুবন জয় করেছিল। করেছিল ঠিকই। পারেনি সেই অধিকার বজায় রাখতে। হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল।

একালের দত্যিরাও সেই অসাধ্য-সাধনে মেতেছে। অধিকার করছে অনেক কিছু। আরও করবে। কিন্তু কায়েম থাকবে তো সেই অধিকার? শেষ রক্ষা হবে তো? হবে যদি, তাহলে হচ্ছে না কেন?

প্রাকৃতিক দত্যির সামান্য একটা হামলা তাহলে সামলাতে পারে না কেন ঐ বিজ্ঞান-তনয় উড়ো-দত্যিটা?···

হাসি পেলো অসীতের। হাসতে গিয়েই সে কিন্তু থমকে আত্মস্থ হয়ে উঠলো।

এসব কী ভাবছে সে আবোল-তাবোল? পাগল হয়ে গেল নাকি অসীত ঘোষ?

একটা ঝাঁকানি দিয়ে সে মগজ থেকে পাগলা চিন্তার কীট-গুলোকে তাড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল।

এখন কি তার ঐসব উদ্ভট দার্শনিক তত্ত্ব ভাববার সময়? উড়োজাহাজটা ভাঙেনি তো? গোটা আকাশটাই যেন ভেঙে পড়েছে অসীত ঘোষের মাথায়।

মাথা ভাঙা নাক-থ্যাবড়া ডাকোটাখানার দিকে আবার তাকিয়ে তাকিয়ে অসীত ভাবতে লাগলো। উদ্ধার করার মতন আর কোনও সামগ্রী তার মধ্যে আছে কি না।

মনে হলো নেই, খোঁজাখুঁজি তো কম হয়নি। থাকবেই বা কি করে? আর কিছু তেমন মাল নিয়ে উড়লে তো?

মান্ধাতার আমলের সাত পুরানো ঝড়ঝড়ে প্লেন, শক্ত মেহনতের কোনও কাজ ওকে দিয়ে করাতে পারলে কি আর আসাম-কাছাড়ের ঐ বুনো অঞ্চলের ওপর দিয়ে বেসরকারীভাবে ওকে ঐ অল্প ভাড়ায় সবরকমে ভাড়া খাটানো হ'তো?

এমন হাল যে কাজ চলা গোছের একটা প্রাথমিক-চিকিৎসায় সস্তা বাক্সও ওর জোটেনি। বেতারের সরঞ্জামেরও নামগন্ধ ছিল না।

প্রথমেতো আজে-বাজে মাল বইতো। তেমন তেমন খদ্দের জুটলে তাদের ও তুলে দিত। নেহাৎ দায়ে পড়ে না হলে, কিম্বা পয়সার ঘাটতি না থাকলে ঐ জরা-গ্রস্ত পুষ্পক রথে উঠতোও না কেউ, তাও যদি অবশ্য আবার ছোটখাট পাড়ি হোত, তবেই।

অসীতরাও অমনি নাচার হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল ঐ ডাকোটায়। তাড়াতাড়ি ছিল খুবই, হাতে ছিল ভীষন জরুরী কাজ। অথচ নামকরা কোনও প্রতিষ্ঠানের প্লেন পাওয়া সম্ভব হয়নি তখন অসীতের পক্ষে, তাই ওতেই সওয়ার হতে বাধ্য হয়েছিল। যাত্রাটা যে এমন মারাত্মক যাত্রায় দাঁড়াবে, তাকি তখন ও একটিবার কল্পনা করতে পেরেছিল?

আর কতটুকুই বা পথের পাড়ি? বড়জোর দু'চার দশ মাইল।

ডিব্রুগড় থেকে জোড়হাট হয়ে গৌহাটি।

ডিব্রুগড় থেকে সোজা গৌহাটিতে যাওয়ার কথা। কিন্তু শেষ মূহূর্তে কীভাবে যেন খবর পেয়েছিল ঐ ডাকোটার ঝানু ব্যবসায়ীরা যে জোড়হাটে আটক পড়ে আছে এদেরই মতন আর ক'জন

যাত্রী। তাই ফালতু কিছু রোজগারের লোভে জোড়হাটে ও নেমেছিল ক'মিনিটের জন্যে। আর তাই যাত্রাপথটা ওদের বিরক্তি-কর ভার তিরিশ-চল্লিশ মাইল বেড়ে গিয়েছিল।

তা বাড়লই বা? উড়োজাহাজের ফাঁকা পথে ঐটুকুর তফাৎ আবার তফাৎ নাকি?

হয়তো তফাৎ কিছু ওরা টেরও পেতো না। কপালের দুর্ভোগ যাবে কোথায়? তাই সওয়ারী সমেত আকাশবিহারী বৃদ্ধ বাহনকে মাত্র মাঝ পথ বরাবর এসেই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় ঘায়েল হয়ে দেহরক্ষা করতে হয়েছে সংযুক্ত মিকির ও উত্তর পাহাড়ের পার্বত্য অঞ্চলের এই দুর্ভেদ্য জংগলে।

দুর্ঘটনার আগে বেসামাল ডাকোটা তার বাধাপথ থেকে ছিটকে পড়েছিল অনেকটা দক্ষিণে। তা না হলে ওদের এই জনমানবহীন প্রদেশের জংগলে এসে পড়তে হোত না। হয়তো কোনও লোকালয়ের কাছাকাছি নামতে পারতো।

কিন্তু সত্যিই তা হলে অবস্থাটা এর চেয়ে ভাল হোত কি?

এখানে তো তবু বন জঙ্গলের নরম জমিতে চোটটা শুধু ঐ ডাকোটার মাথার দিকটা আর দুজন ক্রু পাইলটের অপমৃত্যুর ওপর দিয়েই গেছে। কিন্তু—

সহর অঞ্চলে পাকা পথ ঘাট কিম্বা ঘর বাড়ির ওপর যদি মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়তো ডাকোটা? কিন্তু যদি নামতে বাধ্য হতো উত্তাল ব্রহ্মপুত্রের অথৈ গর্ভে? শিউরে উঠলো অসীত। না, ভাবা যায় না।

জোর করে মন আর চোখদুটিকে সে আবার ফিরিয়ে আনলো ডাকোটাখানার ধ্বংসাবশেষের ওপর। আছে কি আর কিছু এখনও ওর মধ্যে?

না। নেই। অন্ততঃ এখন যে-দুটো জিনিষের ওদের সবচেয়ে বড় দরকার সেই আহার্য আর পানীয় নিশ্চয়ই কিছু পড়ে নেই।

থাকবে কি করে? আর কেউ সংগে করে কিছু নিয়ে উঠলে তো?

যাত্রীদের মধ্যে যার সংগে যা কিছু আহার্য-পানীয় ছিল, তাতো ওরা বার করে একত্র করে রেখেইছে।

কী-বা ছিল?

জনতিনেক যাত্রীর সংগে ছিল দ্বিপ্রাহরিক আহার্য। জনতিনেকের সঙ্গে প্রাতরাশ।

তাই ভরসা। এছাড়া জার্মান—দুটো সংগে করে নিয়ে যাচ্ছিল টিনে করে আধ ডজন বীয়ার। তাও পেয়েছে। জল মাত্র তিনটে ওয়াটার বটলে। আর কার যেন ফ্লাস্কে খানিকটা কালো কফি।

ব্যাস্। এই ওদের তামাম মজুদ রসদ।

সেগুলোকে অসীত সাবধানে টেনে বার করে এনেছিল প্লেনের ভেতর থেকে। আছে তো এখনও মজুত, কিন্তু থাকলে কী হবে?

তারপরের ভাবনাটা যতবারই ভাবতে চেষ্টা করেছে অসীত। তার মাথা ঘুরে গেছে। কূলকিনারা দেখতে পায়নি সেই উত্তাল ভাবনা সমুদ্রের।

দুর্ঘটনায় ধাক্কা থেকে বেঁচে আহত আর অনাহত হয়ে তখনও বেঁচে রয়েছে যেকটা মানুষ, একটু পরেই তো সবকিছু ছাপিয়ে তাদের পেটের মধ্যে জ্বলে উঠবে জঠরাগ্নি। দেহ দানব তার প্রাপ্য মাপে করবে না কাউকে। তার চাহিদা তার দাবী সর্বকালে সব অবস্থায় সমান তৎপর।

এখন? ঐটুকু সম্বল নিয়ে সামলাবে কি করে অসীত?

কতক্ষণ সামলাবে? ক'দিন?

একটি-দুটি মুখ তো নয়? পুরো এগারোটি। বাচ্চা নয়। সবাই বড়। ক্ষুধার-খাদ্য যে ওদের কারো আছে তাও মনে হয় না।

সমস্যাটা নতুন করে মনে পড়ার সংগে সংগে অসীতের চোখদুটো ঘুরে গেল সামনের দিকে। দেখতে পেল ফাঁকা অংশটুকুতে পুরা নরম ঘাসের গালচের ওপর হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে সবাই।

দুই

হঠাৎ একজন আগন্তুক এসে পড়লে মনে করবে,—চড়ুই ভাতি করতে এসেছে ওরা। কিছু হয়নি যেন ওদের। শুধু মুখ বন্ধ হয়ে গেছে অনেকেরই। অনেক কথা বলার পর কথা যেন তাদের ফুরিয়ে গেছে। কিম্বা বে-দম হয়ে গেছে বলেই যেন এখন আর কথা বলার স্পৃহা নেই ওদের কারো।

সাতটি পুরুষ। চারটি নারী।

নারীদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠা যিনি, নাম তাঁর বিভা দেবী। বছর চব্বিশ বয়েস। কাঁচা সোনার মতন গায়ের রঙ। বিধবা। শুচিস্মিতা। সর্ববয়সে হিন্দু বিধবার সাত্তিক সংযমের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। পরনে থান। দামী নামাবলী। ভক্তিমতী। তীর্থে তীর্থে দেব দর্শন করে কাটান। এবারেও কোথায় যেন কোন্ অখ্যাত তীর্থস্থানে জাগ্রত দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে ফিরছিলেন। একা নয়। সংগে একজন পুরুষ আছে। আশ্চর্য ব্যাপার। একটুও আঘাত পাননি তিনি কোথাও। হয়তো তীর্থদর্শনের পুন্যেই। প্রথম চোটটা সামলে নেয়ার পর থেকে দলের মধ্যে দেখা গেল তাঁকেই সবচেয়ে নির্বিকার। যেন কিছুই হয়নি এমনি নির্ভাবনায় তিনি সটান নামের মালা জপকরে চলেছেন।

তার পরেই শ্রীমতি দেশাই,—সুমতী দেশাই। মাঝ-বয়সী গিন্নীগোছের সধবা মহিলা। গুজরাটি। শিক্ষিতা। কেম্ব্রিজের ডিগ্রীধারিণী। অভিজাত রমণী।

ডান পাটি ভেঙ্গে গেছে তাঁর পড়ে পড়ে কাঁদছিলেন। তিনিই হয়ে উঠেছেন ওদের সবচেয়ে বড় দায়। ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই।

তৃতীয় শ্রীমতির নাম রীতা সেন। খ্রীষ্টান কিন্তু নয়। হিন্দু। বাঙালী। কুমারী। বছর চব্বিশ বয়েস। যেন রক্তরাঙ্গা স্পেণীয় তলোয়ার একখানি, দেহ সম্পদের প্রাচুর্যে মোহময়ী, তার ওপর পর্যাপ্ত সাজ পালিশে চোখ ধাঁধানো। নিজের সম্পদ সম্পর্কে মেয়েটি সদা-চেতন।

হাব-ভাবে মনে হয়, পুরুষ যেন মানুষই নয় তার কাছে। যাকে খুশি যখন খুশি অনায়াসে জয় করে তাদের নিয়ে যেমন খুশি পুতুলখেলার সহজাত সনদ সে সঙ্গে নিয়েই ফিরছে।

নৃত্যশিল্পী। ডিব্রুগড়ে মোটা টাকায় কন্ট্রাক্টেকটা এ নাচ দেখিয়ে গৌহাটি, জয়ের বাসনায় প্লেনে চেপেছিল। তেমন বিশেষ কিছু চোট লাগেনি। বাঁ হাতটা একটু মচকে গিয়েছিল, আর সামান্য তু একটা জায়গায় পুড়ে গিয়েছিল। পুরুষদের মধ্যে কে যেন মচকানো হাতটা টেনেটুনে দিয়েছিল।

সেবাটুকুকে অবশ্য প্রাপ্য খাওয়ার মতন উপভোগ করে তারপরেই সেই যুবকটির চোখের ওপর সে মচকানো হাতটাকে এমনভাবে রুমাল দিয়ে মোছা মুছি সুরু করে দিয়েছিল যেন পুরুষটির হাতের ছোঁয়ায় হাতটা তার কালো কিংবা অশুদ্ধি হয়ে গেছে। কাটা--ছড়াগুলোকে সে গ্রাহ্যই করেনি। হাতটা সামলে নিয়েই ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে সে সবার আগে তার শ্রীমুখের রঙ-কাজটুকুতে মেরামত করতে লেগে গিয়েছিল। শ্রীমতী রীতা সেনকে সার্থক নৃত্যশিল্পী হবার মতন দেহ সৌষ্ঠব অবশ্যই দান করেছেন স্রষ্টা, কিন্তু অসীতের মনে হচ্ছিল সে নৃত্যশিল্পীর চাইতে সে যেন নিজেকে ম্যাক্স্—ফাক্টারের এক জীবন্তিকা বিজ্ঞাপন করে হাজির করতেই বেশী তৎপর।

অন্যটি শ্রীমতী লতিকা মাদ্রাজি। মাদ্রাজী তরুণী।

সুশিক্ষিতা। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। পরিষ্কার বাংলা বলেন। ইংরেজীও নিখুঁত। প্রায় রীতা সেনের সমবয়সী। রূপসাগরিকা। রীতার মতন উগ্র-প্রসাধিতানন।' তবু লতিকার গালে আপেল আর ঠোঁটে টম্যাটোর বর্ণ সুষমা। হরিনাক্ষী রহস্যময় চাহনি। সধবা না কুমারী বোঝবার উপায় নাই।

রূপের মতন লতিকার গুণের পরিচয় পেয়েছে অসীত। এমন দুর্ঘটনার পরেও দেখেছে তাকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে। শ্রীমতী দেশাই-এর ভাঙা পায়ে পট্টি বাঁধবার সময় যে সাহায্য করেছে অসীতকে, মিষ্টি কথায় সুস্থ হবার আশ্বাস দিয়ে মেয়ের মতন সেবাও করেছে দেশাই-গৃহিনীর।

অথচ ওরই মধ্যে আশ্চর্য লক্ষ্য করেছে অসীত। লতিকার মধ্যে রয়েছে একটা বিচিত্র বৈশিষ্ট্য। কাছে আসে যত সহজে আবার যেতে পারে ঠিক তেমনি অনায়াসে। অ-ধরা কন্যা। যেন আধুনিকা মায়া মৃগী। এমন সাবলীল স্বচ্ছন্দে তরুনী অসীত আর দেখেনি।

পুরুষদের মধ্যে আছেন গদাধর দেশাই। শ্রীমতী সুমতীর স্বামী। কীসের যেন সম্পন্ন ব্যবসাদার। সহরে সহরে কেন্দ্র আছে তাঁর ব্যবসার। স্বল্পভাষী। সম্ভ্রান্ত।

আর আছে ঐ দুটি জার্মান। কেলিম্যান আর রোভার। গদাধরের মতন অত না হলেও বয়েস হয়েছে কেলিম্যানের। সেই বয়সের ছাপ কিন্তু পড়েনি তার কঠিন দেহে। ছট্‌ফট করছে সে এমনি ভাবে আটকে পড়ে। যেন অধৈর্য আর অস্থিরতায় ফেটে পড়তে পারে যে কোনও মূহূর্তে।

রোভার তরুণ। অসীতেরই প্রায় সমবয়সী। বয়সের অত পার্থক্য সত্ত্বেও কেলিম্যান আর রোভার শুধু স্বজাতি সূত্রে বন্ধুই নয়, তাদের অন্তরঙ্গতা বিস্ময়কর।

প্রাণ প্রাচুর্যে রোভার টলমল। তবে ছট্‌পটে নয় সে কেলি-

ম্যানের মতন, পিট্‌পিটে। ক্ষুদে ক্ষুদে ধূসর চোখতুটো তার থেকে যেন এত কিছুর মধ্যেও নেচে উঠতে চায় চিকচিকে কৌতুকে।

এরপরেই নন্দলাল গোস্বামী। বাঙালী সন্ন্যাসী। কোন মঠবাসী। বিভা দেবীর গুরু ভাই ও সংগী। বয়সে তরুণ। হয় তো অসীতের চেয়েও বছর কয়েকের ছোট। আশ্চর্য হাসিখুশি ছেলেটা। আর আশ্চর্য দক্ষতা তার জীবনটাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করে সুখতুখ—হাসিকান্না সব কিছুকেই সমানে হাসিমুখে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করার। বিস্ময়কর ক্ষমতা লাভ করে এরই মধ্যে সে যেন হয়ে উঠেছে মুক্ত পুরুষ।

নন্দ গোস্বামী বসে আছে জপরতা বিভাদেবীর পাশে। মাঝে মাঝে কথা হচ্ছে। হেসে উঠছে।

রোভার ছোকরা উঠে গিয়ে বসলো রীতার কাছে। অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই বসে পড়লো তার পাশে। অনর্গল তড়্‌তড়িয়ে কী যেন বলে বসলো। মরালীর মতন বারেক ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো রীতা তার দিকে। চোখের তারা তুটোকে বাঁকোণে বিমোহনভাবে টেনে আনলো। স্পেনীয় তলোয়ার চিকচিকিয়ে উঠলো সেই চাহনিতে।

অসীত ছাড়া বাকি আর তুজন পুরুষকে বসে থাকতে দেখা গেল সবার থেকে বেশ খানিকটা দূরে,—লতিকাকে সংগে নিয়ে।

তাদের একজনের নাম সরোজ লাল মারাঠে। মারাঠি ভদ্রলোক। ছোকরা নয়। মাঝ বয়সী। বেশ শক্ত সমর্থ দেহ। ক্ষমতাবান। অসীতের সংগে সম্পর্কটা দাঁড়িয়ে গেছে একটু বিচিত্র রকমের অস্বস্তিকর। তবু তার ওপর যথেষ্ট আস্থাও রয়েছে অসীতের। ঐ বুনো অঞ্চলের সবকিছু যেন সরোজ লালের নখাগ্রে। জীবন্ত ম্যাপ একখানা।

অন্য মূর্তিমানটি পাঞ্জাবী ছোকরা। নাম তার রনজিৎ সিং। অত্যাধুনিক মত্ত জোয়ান। নিখুঁত ছাঁটকাটের দামী সুদৃশ্য বিলিতি

স্যুট্ পরনে। বেশ বোঝা যায়। জন্ম হয়েছে তার সোনার ঝিনুক মুখে নিয়ে। তাই হয়তো অনিবার্যভাবে স্বভাবে আচরণে এসে গেছে খানিকটা উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া ভাব। দেখতে সুশ্রী হলে কী হয়? মেজাজটা যেন খান্‌জা খাঁর। নাক উঁচু করেই আছে। ধরাকে সরা দেখছে।

অসীতের সংগে অবিশ্যি এতক্ষণের মধ্যেও রণজিৎ সিং-এর ঘনিষ্ঠ আলাপ অথবা ঠোকাঠুকি কিছুই হয়নি। তবু কেন যেন তার সটান মনে হচ্ছিল,—কে যেন অসীতের মনের মধ্যে বলে দিচ্ছিল,—তাকে নিয়েই বাধবে ঝামেলা। বাধবেই। অথচ কেন যে বাধবে, এবং কীরকম দাঁড়াবে সেই ঝামেলাটা, তা অসীত কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছিল না।

সিগ্রেটটা ফুরিয়ে এসেছিল। টুকরোটাকে তাচ্ছিল্যভরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অসীত পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো ওদের কাছে।

অতগুলো মানুষের মধ্যে একমাত্র অসীতই একজন।

উড়োজাহাজ সমেত মাটিতে নামতে বাধ্য হয়ে সবাই মিলে যখন কান্না-কাটি আর চিৎকার-হট্টগোল জুড়ে দিয়েছিল, একমাত্র অসিতই তখন সাহস দিয়ে, আশ্বাস দিয়ে সবাইকে ধাতস্থ করার চেষ্টা করেছিল। পরবর্তী করনীয়গুলোর নির্দেশ এসেছিল তারই কাছ থেকে।

আর তখন থেকেই অবিশ্বাস্য ভাবে যেন সবার ভার গিয়ে পড়েছিল অসিতেরই ওপর। হয়তো তার লম্বা-চওড়া কাঠামোটার জন্যেই সবাই অজ্ঞানতে তারই ওপর নীরবে আত্মসমর্পন করে নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল বোধহয় তারা অসীতের সোচ্চার ব্যক্তিত্বে।

ক্রু আর পাইলট দুজনের গোর দেবার ব্যবস্থাতেও তাই অসীতকেই অগ্রনী হতে হয়েছিল। অবশ্য সবাই তাকে সাহায্য করতে হাত লাগিয়েছিল।

ঐ বীভৎস লাশ দুটোকে সবার সামনে থেকে সরিয়ে ফেলার আশু প্রয়োজন বোধ করেছিল অসীত। অতবড় বিপদের পরে সবার চোখের সামনে অমন বীভৎস দৃশ্য পড়ে থাকলে ওদের মনে যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারতো, তা হয়তো নিয়ন্ত্রন করা অসাধ্য হয়ে উঠতো।

গদাধর দেশাই তার তৃনশয্যাশায়ী স্ত্রীর পাশে বসে পরম সহানুভূতি ভরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন সুমতীর ভাঙা পায়ে। ওষুধ নেই। ডাক্তার নেই। তবু যেন স্ত্রীর আঘাতে ব্যথাতুর হয়ে প্রৌঢ় স্বামিটি মলিন দরদী হাতে এসে মুছে নিতে চাইছে রোগ-শয্যায় শায়ীতার ব্যথা ভার।

অসীত মনে মনে ভাবলো, দুনিয়ায় কোনও ডাক্তার কোনও নার্সের ওষুধ, আশ্বাস আর সেবার মধ্যে এমন ব্যথাতুর মমতার অস্তিত্ব সম্ভব কি?

জিজ্ঞাসা করলে—খুব কষ্ট হচ্ছে সুমতী দেবী?

মুখ তুলে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই এক সংগে তাকালে অসীতের দিকে। তাদের সন্তানের বয়সী এই যুবকটির প্রশ্নে সহানুভূতি আর সম-বেদনায় প্রচ্ছন্ন সুরটি হয়ত তাদের কারোরই কান এড়ালো না। অদৃশ্য ছোঁয়ায় মনে মনে বিশ্বামানবতার সংগুপ্তুতায়ে মধুর উঠল রমণ।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই মুখে ফুটে উঠলো স্মিতাভা।

ভাঙা পায়ের অসহ্য যাতনা কোন্ অভাবনীয় সহ্যমতায় লুকিয়ে রেখে মুখে এক ঝলক প্রসন্ন হাসি ফুটিয়ে তুলে শ্রীমতী দেশাই বললেন—না বেটা। ফিকির মৎ করো। এখন অনেকটা সহ্য করতে পারছি।

যেন স্নেহাতুর জননী তাঁর অসুস্থতায় উৎকণ্ঠাকুল সন্তানকে নিরুদ্বেগ করতে চাইলেন।

অকস্মাৎ কী যেন হয়ে গেল অসীতের। বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠলো। একটা অসহ্য পুলক ভারে গলাটা বুজে আসতে চাইলো কোন একটা নাম-না-জানা উচ্ছ্বাসাধিক্যে। মিনিট খানেক গেল সামলাতে।

তারপর কোন রকমে বললো—সেরে যাবে। ভগবান সারিয়ে দেবেন।

—হ্যাঁ বেটা পরমাতমারা মর্জি হলে ঠিক সেরে যাবে পরমাতমা!

নিজের মুখের কথাটা কানে যেতে নিজেই চমকে উঠলো অসীত।

এমনভাবে ভগবান বিশ্বাসী হোল অসীত কবে থেকে? কতদিন পরে এভাবে মুখ দিয়ে বার হোল তার ভগবানের দোহাই?

মনে পড়লো না অসীতের। কিছুতেই না। তবু মনে মনে সে একান্তে কামনা করলে, সত্য হোক্ সুমতী দেবীর মিথ্যে আশ্বাস।

ত্রস্তে সেখান থেকে সরে গেল অসীত। মনে মনে হয়তো লজ্জা পেল নিজের এমন আকস্মিক মানসিকতায়। দুর্ঘটনা আর দুর্বিপাক মানুষকে এমনি ভাবেই দুর্বল আর ভাবালু করে তোলে। কিন্তু না। তা হলে এখন চলবে না অসীতের। নরম হলে চলবে না। তাকে শক্ত হতে হবে। পা বাড়ালো অসীত একেবারে বিপরীত দিকে।

বিভা দেবী চোখ বুজে মালা জপ করছিলেন একমনে। পায়ের শব্দ পেয়ে জপ করতে করতেই আধ মেলা চোখ মূহূর্তের জন্য খুলেই আবার বুজিয়ে ফেললেন। মনে হোল যেন নিরাশ হয়েছেন। কারণটা অসীত বুঝে উঠতে পারলো না।

তিনি কি ভেবেছিলেন যে তার জপের প্রভাবে স্বয়ং বিপত্তারন

নারায়ন পায়ে হেঁটে আসছিলেন তাঁর কাছে তাঁকে উদ্ধার করতে ? তাঁর বদলে অসীতকে দেখেই কি তিনি অমন ভাবে ভ্রূ-কুঁচকে…? ভাবনায় অসীতের বাধা পড়লো। দেখলো, খুক খুক করে হাসছে নন্দ গোস্বামী।

তিন

জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তার দিকে অসীত তাকাতেই হাসতে হাসতে নন্দ গোস্বামী বলে উঠলো, বুঝতে পারলেন না ?

—না তো।

— পিঁপড়ার মরবার সময়ে কি হয় ?

—ডানা উঠে।

—আমাদেরও উঠেছিল।

— মানে ?

—মানুষ হয়ে ঐ উড়োকলে উঠেছিলুম না ? ডানা নেই ওর ? ব্যস্, হোল তো পিঁপড়ের জ্ঞান। সাধে কি মহাজনেরা বিপথ-গামীদের বলেন উড়তে শিখেছে ? এই জন্যই বলে।

কথার সংগে সংগে পরমানন্দে হেসে ফেললো নন্দ গোস্বামী।

জপরত হাতটাকে মালাসমেত কপালে ঠেকিয়ে বিরতির জন্যে বোধ হয় দেবতার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে মৃদুকণ্ঠে ধমকে উঠলেন বিভা—তুমি থামবে নন্দ ?

নন্দের কণ্ঠের হাসি থামলো বটে, কিন্তু চোখদুটো তার সমানে চিকচিক করতে লাগলো হাসির ঝিলিকে। যেন দুর্ঘটনায় পড়েনি এতগুলো মানুষ। একটা মজার মেলা চলেছে তাদের নিয়ে। অবাক হোল অসীত।

এ কোন্ আশ্চর্য ক্ষমতা, যার বলে নন্দ গোস্বামী জীবনের এতবড় দুর্যোগকেও সহজভাবে মেনে নিয়ে অবিচল রয়েছে ? কোন দর্শনের ভিত্তিতে এতবড় সর্বনাশটার মধ্যে কৌতুকের খোরাক পেয়ে সে অমন পরমানন্দে হাসতে পারছে ? সরে গেল অসীত ওদের কাছ থেকে।

রীতা সেনের পাশে বসে অনর্গল কি সব বলে যাচ্ছিল রোভার। রীতার কিন্তু সে সব ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই। বাহারে ব্যাগটি খুলে ছোট্ট আরসিখানা সামনে ধরে সে তখন নিপুন হাতে রাঙা করে চলেছে তার ঠোঁট দুটোকে লিপিষ্টিক ঘষে ঘষে।

অসীত কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই যেন বাধাহত হয়ে অনিচ্ছাভরে চুপ করে গেল রোভার।

আরসীতে চোখ রেখেই সমানে রূপচর্চা চালাতে চালাতে আরসীর মধ্যেই প্রতিফলিত অসীতকে বলে উঠলে রীতা—এই জার্মান ষাঁড়টাকে আমার ওপর লেলিয়ে দিয়েছেন কেন?

অভিযোগের অভিনবত্বে বিস্মিত হলো অসীত।

—আমি? কী বলছেন?

—মোড়ল হয়েছেন আপনি। বলবো কাকে?

—ওকে বলতেই তো পারতেন।

—একশোবার বলেছি। শোনে? এসেছে তো আর নড়বে না। কান ঝাঁ ঝাঁ করে দিলে।

রোভার হঠাৎ ইংরেজীতে প্রতিবাদ করে উঠলো—আর তুমি? চোখের ইশারায় তুমি তখন আমাকে ডাকলে কেন তাহলে? বোঝা গেল, মোটামুটিভাবে বাংলা তাহলে বোঝে রোভার। এতক্ষণে ঠোঁটের রঙকাম সেরে ঘাড় ফিরিয়ে ফোঁস করে উঠলো রীতা—বেশ করেছি। তখন থেকে তুমিই বা অমন করে আড়নয়নে হাসছিলে কেন সে সময়? দেখলে না বুঝি? তোমার মতলব খানা কি?

তোমার যে এমন দুর্ভিক্ষের ক্ষিদে তাকি তখন জানি? জলদি ভাগো।

রাগ করলো না রোভার। হো হো করে হাসতে হাসতে উঠে গিয়ে বসলো সে অনেকদূরে কেলিম্যানের কাছে।

অসীত ভেবে পেল না। এমন অবস্থাতেও একা এসব চালাচ্ছে কি করে? কী এরা?

রীতা ততক্ষণে লিপষ্টিক ব্যাগে পুরে পাউডার মাখতে শুরু করেছে তার টিকালো মুখখানায়। সেই অবস্থাতে আবার বলে উঠলো—কি হোল? ওকে তাড়িয়ে আপনি রইলেন নাকি?

আমি? কেন?

—কেন তা আপনিই জানেন। আমি কিন্তু এমন পর পর এত ধকল সামলাতে পারবো না। এখন থামুন। একটু সামলে নিই। তারপর আসবেন।

প্লীস্ন! ধরফরিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল অসীত।

কেলিম্যান আর রোভার মিলে তখন দুর্বোধ্য মাতৃভাষায় কী সব আলোচনা সুরু করে দিয়েছে। একটিবার চোখ মেলেও তাকালো না অসীতের দিকে।

ওদের কাছে থেকে খানিকটা দূরে একসংগে বসেছিল লতিকা রণজিৎ সিং, আর সরোজ লাল মারাটে। অসীতকে আসতে দেখেই ভ্রূ বেঁকে উঠলো রণজিৎ সিংয়ের। ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালো লতিকাও। সংগে সংগে সে রণজিৎ সিংয়ের একটা হাত ধরে টেনে দাঁড় করালো।

বলে উঠলো—কুড়ের মতন বসে থেকে লাভ কি রণজিৎ? তার চেয়ে চলো একটু ঘুরে আসি। আহ্বান পেয়ে যেন নেচে উঠলো রণজিৎ।

পা বাড়ালো ওরা দুজনে অন্তরংগভাবে হাত ধরা-ধরি করে।

বলার ইচ্ছে ছিল না অসীতের তবু বাধ্য হয়ে বললো—ফাঁকায় বাইরে জংগলের মধ্যে যাবেন না যেন।

তাদের কানেই গেল না যেন অসীতের কথাগুলো। চরম উপেক্ষা ভরে ওর নাকের ওপর দিয়ে তারা বলে গেল।

তাদের ভাবনাগতিক দেখে ক্ষণেক বোম্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অসীত।

তারপর ভাবলো—মরুক্‌গে। যা খুসি করুক্। ভুগলে ওরাই ভুগবে।

অসীত বসে পড়ল সরোজ লালের পাশে। কটা মূহূর্ত দুজনেরই নীরবেই কেটে গেল। শেষে অসীতই বলে উঠল—তারপর ?

আরো আধমিনিট্ টাক চুপ করে থেকে সরোজ লাল আনমনা ভাবে সাড়া দিল—দেখা যাক্।

কেমন যেন ঝিম্ মেরে গেছে মানুষটা। হয়তো দুর্বল থাকায় আকস্মিকতায় সে থ হয়ে গেছে। ভেতরে ভেতরে হওয়া অস্মাভাবিক অবশ্য নয়।

তবু একথাও কিন্তু অসীতের মনে হোল সংগে সংগে যে সরোজ লালের ওভাবে ঝিম্ মেরে যাওয়ার আসল কারণটা তা নয়।

সে-কারণটা আরও আগের। আরও পিছনের। অসীত আবার জিজ্ঞাসা করলো—ঠিক কোনখানে আমরা এসে পড়েছি। সেটা কিছু আন্দাজ করতে পারছো ? জবাব এলো—পারছি মোটামুটি।

কথা শেষে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল দূরে-লতিকার দিকে। সে যেন দৃষ্টির দিতে গিয়ে চেপে চেপে দেখতে লাগলো সুন্দরী লতিকাকে, অসীত দেখতে লাগল যেন তার প্রত্যেকটা পদক্ষেপ। আর তারই তালে তালে সুন্দরীর যৌবন—থরথর বর তনুর প্রতিটি স্পন্দন। আবার অবাক হোল অসীত।

পরক্ষনেই একটা অস্বস্তিকর ভাবনা তাকে পেয়ে বসলো। কেন ?······কেন ?······যে বয়সে সুন্দরীমাত্রেই পুরুষের চোখে-মনে রঙ ধরায় সেবয়সটা কাটিয়ে উঠেছে অসীত অনেক কাল। মেয়েদের সম্পর্কে কাঙালপনা ও তার কোনদিন নেই। এবং স্বভাবটা তার উল্‌টোই। ওদের সে সাধ্য মত পাশ কাটিয়েই চলতে চায়।

কিন্তু বারবার আশ্চর্যে লক্ষ্য করছে অসীত যে তার সেই পরিহার প্রচেষ্টার ফল দাঁড়াল বিপরীত। মেয়েরা আরো বেশী করে এখন অসীতকে টানতে চায়—হয়তো রাগে, হয়তো বা আত্মাভিমানে ঘা খেয়ে।

তাছাড়া চেহারাটাও অসীতের মন্দ নয়। ছয় ফুটের ওপর লম্বা। তেমনি চওড়া ইয়া ছাতি। চওড়া মজবুত কবজি। চওড়া কপাল। ঘন কুঞ্চিত একমাথা চুল আপনা থেকে ঢেউতুলে সুবিন্যস্ত। গায়ের রঙটা ও বিস্ময়কর ভাবে রক্তাভ সুগৌর। সর্বাংগ ঘিরে ঝলমল করে স্তব্ধ শ্রী।

দেশে বিদেশে বহু রূপসীর সপ্রশংস কটাক্ষবান সহ্য করতে হয়েছে অসীতকে। ঐ চেহারাটার জন্যেই আগেকার অবাঞ্ছিত অনেক নারী-দুর্যোগের মেঘ ও তার মাথার ওপর ঘনিয়ে এসেছে। নারী-মহলে সে যেন একজন বাঞ্ছিত পুরুষ। সেটা জানতে অসীতের বাকি থাকেনি। খুঁজে তাকে বার করতে হয়না। দেহের বৈশিষ্টের জন্যে ভীড়ের মধ্যে অসীত হয়তো সবার আগেনজরে পড়ে।

অথচ, অসীত কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না যে মাদরাজি কন্যা লতিকা। কেন ওকে ওভাবে উপেক্ষা করে চলেছে? অসীত যেন বিষ নজরে পড়েছে ওর। সেই প্রথম দর্শন থেকেই এমন ভাব দেখাচ্ছে লতিকা, যেন সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না ব্যাসাতের অশস্থিতিটুকু পর্যন্ত।

কী ক্ষতি করেছে অসীত লতিকার? অন্তরায় হয়েছে তার কোন্ অজানা কাজে?

মাত্র ক'ঘন্টা আগে ডিব্রুগড়ের এরোড্রোমে একসংগে ঐ ডাকোটা খানায় ওঠার আগে ওকে তো অসীত দেখেনি কোনদিন। তাহলে?

ফাঁকা জায়গাটুকুর একেবারে বিপরীত সীমান্তে রনজিৎ সিংএর

সংগে হাত ধরাধরি করে গাঁ-ঘেঁসে বেড়াচ্ছে আর কী সব কথা বলছে সাহিত্য। রনজিৎ সিং এর মুখেই খই ফুটছে। থেকে থেকে ডাগর দুটো চোখের পাতা তুলে কখনও বা তির্যক দৃষ্টিতে লতিকা তাকাচ্ছে রনজিতের দিকে। চোখে চোখে মিলছে। হাসছে। মীনা হারিন্দ হাসি। হাসিটা লতিকার চমৎকার। শুধু তার মুখ হাসে না। কেন হাসে না; হাসে আরবার।

বেশ চেনা যাচ্ছে যে খণ্ডর অংগ তাদের প্রনয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু—

মাত্র কিছুক্ষন আগেই সর্বপ্রথম টের পেয়েছে অসীত যে লতিকা কুমারী নয় বিবাহিতা। ওদের কাছে এসে দাঁরাবার সময়ে পিছন থেকে সে শুনতে পেয়েছিল। লতিকাকে সম্বোধন করছে রনজিৎ সিং "মিসেস মানদ্রাজি" বলে।

অথচ সত্যিকার সিথিতে সিঁতুর নেই। কেন নেই? থাকে না ওদের? কিন্তু এমন উগ্র আধুনিক যে সিঁন্দুরটাকে একেবারেই বিসর্জন দিয়েছে?

কিন্তু নামটা তাহলে লতিকা সিং নয় কেন? তবে কি———?

না:। মাথামুণ্ডু কিছুই ঠিক করতে পারছে না অসীত। যেন একটা রহস্যময় গোলকধাধার মধ্যে পড়ে গেছে।

এমন অন্তরংগতা ওদের কোন্ সুবাদে? কেন?..........সবচেয়ে বিস্ময়কর আর অস্বস্তিকর ব্যাপার হোল এই যে শুধু ঐ দুটি সহযাত্রী সম্পর্কেই কিছু জানতে পায়নি অসীত। আর সবার সংগে অনেক কথা হয়েছে অসীতের এয়োড্রোমে বসে থাকতে থাকতে আর প্লেনের মধ্যেও।

সেই কথোপকথনের ফলেই অসীত জানতে পেরেছে যে ব্যবসায়ী গদাধর দেশাই সস্ত্রাক ডিব্রুগড়ে গিয়েছিলেন তাঁদের সেখানকার নতুন শাখার ম্যানেজার তাদের নতুন জামাই-এর সংসার গুছিয়ে দিয়ে মেয়ের সংগে দেখা করে আসতে।

জানতে পেরেছিল অসীত যে জার্মান দুটো ওদের কোন্ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের হয়ে আসামের ঐ অঞ্চলে খুলে বসেছে ছোট একটা কারখানা। বাসায় তৈরী করছে একরকম গাছের কাঠগুঁড়ো থেকে টিনে করে তারই স্যাম্পেল্ নিয়ে যাচ্ছিল ওরা।

বিভা দেবী আর নন্দগোস্বামীকে তো জিজ্ঞাসা করে কিছু জানবার দরকারই হয়না। পরিচয়টুকু তাঁদের বেশবাস আর আচরনেই সুপ্রকাশ।

সরোজ লাল মারাঠের নাড়ি নক্ষত্রের খবর তো অসীত অনেক আগে থেকেই জানা।

রীতা সেনকে নিয়ে হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল এরোড্রোমে। নৃত্যানুষ্টানের অনুষ্ঠাতারা দল বেঁধে স-কলরবে ওকে নৃত্যানুষ্ঠানের একখানা হ্যাণ্ড্-বিল ও হাতে পেয়েছিল।

জানতে পারেনি শুধু লতিকা আর রনজিং সিং এর কোনও হদিশ। নিজেদের কথা ওর একটিবার মুখ ফুটে বলেনি। বলেনি। কোথা থেকে ফিরছে ওরা। আর কোথায়ই বা যাবে? জানায়নি এভাবে পাড়ি জমানোর ওদের উদ্দেশ্যটাই বা কি?......

চার

অকস্মাৎ নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠলো অসীত।

যারা ওকে গ্রাহ্যই করেনা। খামকা তাদের জন্যে ওরই বা মাথা ঘামানোর দরকার কি?

জোর করে মন থেকে অস্বস্তিকর ভাবনাটাকে বিদায় করে দিল অসীত।

মাথা ঘামাবার বিস্তর সমস্যা অমন রাক্ষুসে হাঁ মেলে রয়েছে ওর দিকে।

সরোজ লালকে জিজ্ঞাসা করলো—গৌহাটি এখান থেকে কতদূর হবে?

মনে হোল। যেন কোন্ সুদূরের সফর থেকে মনটাকে টেনে—হিঁচড়ে কাছে নিয়ে এলো সরোজ লাল। যেন তন্দ্রাহত হোল।

জবাব দিল—তা'শ' খানেক মাইল তো বটেই! কিন্তু বেশিও হতে পারে।

—কেমনধারা জায়গা এই একশো মাইল?

—পাহাড়, জংগল আর জলা—বাদা।

—পাড়ি দেওয়া মুস্কিল?

—বিলক্ষণ।

—পথে কোনও লোকালয় মিলতে পারে?

— মনে হয় না।

—মানুষ জন?

—বুনো জংলী আর নাগা—দংগল হয়তো।

পরিস্থিতিটাকে এবার ভাল ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলো সরোজ লাল।

একটা শুকনো কাঠি তুলে নিয়ে নরম মাটিতে নিপুন হাতে ম্যাপ এঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলো সরোজ লাল।

—এই দেখুন—এই ভিতর পূর্বে থেকে একটু চালু হয়ে দক্ষিন-পশ্চিমে বয়ে চলেছে ব্রহ্মপুত্র। উত্তর-পূর্ব দিকে।

—ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিনে এই হোল ডিব্রুগড়। আচ্ছা, এই বার এখান থেকে দক্ষিন-পশ্চিম মুখে সোজা একটা লাইন টানুন। এই এই দেখুন—সমস্ত পথটায় মাঝখান পর্যন্ত লাইনটা ব্রহ্মপুত্রের উত্তর দিয়ে যায় তারপর কোথাও ব্রহ্মপুত্রের ঠিক ওপর দিয়ে! কোথাও বা ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিন কূল ঘেঁষে প্রায় দুশো মাইলের মাথায় লাইনটা পৌছেছে গৌহাটি।

·· দেখলাম।

—এই লাইন—বরাবরই ছিল আমাদের এরোপ্লেনের উড়ার পথ।

—তারপর ?

—মাঝ পথ বরাবর আমরা ঠিকই এসেছিলাম লাইন ধরে ধরে। তারপর এরোপ্লেন বেগড়ালো। আমরা বেলাইন হয়ে পড়লাম।

—কোনদিকে ?

—দক্ষিন দিকে। ব্রহ্মপুত্রের প্রায় ৭০।৭৫ মাইল দক্ষিন এ-অঞ্চলটা হোল ব্রহ্মপুত্রের একটা উপত্যকা উচ্চতায় বেশির ভাগ অংশটাই সাগর পিটের সমান। তাই ব্রহ্মপুত্রের দরাজ বদান্যতায় এখানের দিকেই আদিম কাল থেকে শ'এর পর শ' মাইল ধরে ডানা মেলেছে আদিম বন। সভ্যতার আলো এখনও দুর্ভেদ্য বনের ভিতর ছিটকে আসতে পারেনি। আসতে পারেনি এখনও এখানে সভ্য মানুষ তার সাজ—সরঞ্জাম নিয়ে বসতে বসাতে। আসা সহজ ও নয়।

—কেন ?

—এটা শুধু বুনো অঞ্চলই নয়। পার্বত্য এলাকাও বটে। পার্বত্য

উত্তর কাছাড়। ঠিক যে জায়গাটায় এসে পড়েছি, তার খানিক উত্তরেই রয়েছে তিনহাজার ফিট উচু মিকির পাহাড়, পূর্বে প্রাকৃতিক বেড়ার মতন দু'হাজার ফিট উচ্ছ একটানা বিরাট নাগা পাহাড়, আর পশ্চিমেও খানিক দূরে খাসি আর জয়ন্তিকা পাহাড়। পাহাড়গুলো মাকড়শার মতন অসংখ্য ছোটবড় হাত ছড়িয়ে দিয়েছে সবদিকে।

তার ওপর ছড়িয়ে আছে প্রাগৈতিহাসিক জংগলের কম্বল। তাই সভ্য মানুষের আসাও যেমন সোজা নয়, তেমনি হয়তো তাদের টান বা ইচ্ছেও জায়নি এখনও তেমন। ফলে যা হবার, যা অনিবার্য, তাই হয়েছে।

—অর্থাৎ ?

—সভ্যতা যেখানে আসেনি, সেখানে অসভ্যতারই রয়েগেছে একছত্র রাজত্ব। এই আদিম বুনো অঞ্চলের মানুষগুলোও তাই বুনো আদিম, এখানকার জন্তু জানোয়ারও তাই। বন, বন, ঘন বন আর পাহাড়—দুর্ভেদ্য বন আর দুরারোহ পাহাড়।

—কিন্তু এই নির্জন বনের ভেতর এখানটায় এতখানি জায়গা এমনভাবে ঘাস ঢাকা ময়দান রয়ে গেল কি করে ?

সরোজ লাল জবাব দিল—ছিল না। হয়েছে। এবং বুনো একদল মানুষ হয়তো গাছপালা সাফ করে এখানটায় বস্তি পেতেছিল। তারপর কালক্রমে জলাভাব দেখা দিতে তারা হয়তো আর কোথাও উঠে গেছে। হয়তো বছর দশেক হয়নি এখনও। তাই এখানটা এখনও ফাঁকা।

জিজ্ঞাসা করার মতন আর কিছু খুঁজে পেল না অসীত। কিন্তু হয়তো সাহসই পেল না। প্যাকেট খুলে একটা সিগ্রেট বাড়িয়ে দিল সরোজ লালের দিকে।

নিস্পৃহভাবে মাথা নেড়ে সরোজলাল বললো—চলে না, ধন্যবাদ।

নিজেই একটা সিগ্রেট ধরিয়া খানিকক্ষণ ধোঁয়ার রিঙ পাকিয়ে বললো অসিত।

তারপর যেন আপন মনেই বলে উঠলো—আমাদের জন্যে নিশ্চয়ই একটা উড়ো সন্ধানী দল বের হবে। এতগুলো মানুষ আর আস্ত একটা প্লেন নিখোঁজ হোল, তাদের জন্যে— আচ্ছা তারা আমাদের খোঁজ পাবে তো?

সাফ জবাব দিল সরোজলাল— না।

—না?

—তাইতো মনে হয়। কি করে পাবে খুঁজে?

—আমরা যদি হদিশ দেবার জন্যে খানিকটা আগুন জ্বেলে রাখি?

—সমান নিরুৎসাহে সরোজলাল উত্তর দিল—তবুও না।

—কেন?

একটু সরে বসলো সরোজলাল। মনে হোল, কথা বলতে তার যেন বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা বা আগ্রহ নেই। তবু জোর করে কথা বলতে হচ্ছে বলে সে যেন বিরক্তি বোধ করছে।

মুখে কিন্তু তবু সে বললো—আপনি এ-অঞ্চলে নতুন তাই জানেন না যে এখানকার জংগলগুলোর অষ্ট প্রহরই ছোট বড় দু-দশটা দাবানল ধু ধু করে। আপনার ঐ অ্যাতোটুকু আগুন কারো নজরে পড়লে তো?

অসিত তবু বললো—তবু দেখাই যাক্ না চেষ্টা করে?

অধৈর্যকণ্ঠে এবার সরোজলাল বলে উঠলো—বোস্থন, আপনি নিশ্চয়ই কোনদিন অসীম আকাশ থেকে নিচে এমনি বিশাল ঘন-পাহাড়ের মধ্যে সামান্য একটা গর্তের সন্ধান করতে হয়রান হননি। তেমন অভিজ্ঞতা থাকলে আপনি নিজেই বুঝতে পারতেন যে গর্তটার ওপরে হাজির হয়েও নিচের দিকে তাকাতে তাকাতে ততক্ষণে প্লেনটা সেটাকে ছাড়িয়ে দু-চার মাইল দূরে চলে যায়।

তাছাড়া একথাটাত ভুলে যাচ্ছেন কেন যে নীচে নেমে পড়বার আগে আমাদের প্লেনটা বাঁধা পথ থেকে ষাট-সত্তর মাইলের মতন দক্ষিণে ছিটকে পড়েছিল ?

বোবা হয়ে গেল অসিত। মুখে তার একটা কথাও ফুটলো না আর।

বুঝতে তার বাকি রইল না যে নিছক রায় সত্য নয়। তাই তাকে শুনিয়ে দিয়েছে বস্তুবাদী সরোজলাল মারাঠি। আর নিজেরই জীবনে অচিরকালের মধ্যে হয়তো দেখা দিতে চলেছে প্রাণঘাতী নিষ্ঠুরতা এক নৃশংস সত্য, সে কেন আর সত্য গোপন করে চলবে ?

আড় চোখে তাকালো অসিত তার সংগীর দিকে।

সরোজলাল আবার ডুবে গেছে তার ভাবনার মধ্যে।

দৃষ্টি কিন্তু সামনের দিকে স্থির নিবদ্ধ।

তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করলো অসিত।

একটা গাছের নিচু ডালে পা ঝুলিয়ে বসেছে লতিকা। পায়ের কাছে ঘাসের ওপর অনুকম্পার প্রর্থী ডিনাধারীর মতন বসে আছে রণজিৎ সিং।

লতিকার বাঁ পা থেকে ফিতে বাঁধা যায়গাটায় তো খুলে গেছে। রণজিৎ সিং সেটাকে বেঁধে দিচ্ছে। সেবার এহেন দুর্গাৎ সুযোগ পেয়ে সে যেন বিফল হয়ে গেছে।

চকিতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করতে চোখ দুটো গিয়ে পড়লো দেশাই দম্পতির উপর।

ঝুঁকে পড়ে রুমাল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিচ্ছেন সুমতীর যেন প্রৌঢ় গদাধর দেশাই। হঠাৎ ওর দিকে নজর পড়তেই যেন লজ্জা পেলেন তাঁরা। একটু আড়াল হয়ে বসলেন গদাধর। পরক্ষণেই কিন্তু হাত দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে সুমতী তাকালেন অসিতের দিকে।

মুখখানা হাসি হাসি করবার চেষ্টা করে হাতের ইশারায় তিনি

বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে ঘাবড়াবার কিছু নেই, তিনি ভালই আছেন।

আবার বুকের ভিতরটা টনটন করে উঠলো অসিতের।

অনেকটা ওর মার মতন দেখতে। তেমনি মিষ্টি মিষ্টি। তেমনি স্নিগ্ধা।

মা নেই অসিতের কতদিন? সঠিক মনে পড়লো না। দশ-এগারো বছর হবে নিশ্চয়ই। মা থাকলে আজ……

চমকে উঠলো অসিত।

এসব কি ভাবছে অসিত? ছেলেমানুষী, ভাবলো তার সময় নাকি এখন?

বিভা দেবীর জপ সারা হয়েছে। কপালে মৃত্তিকা-তিলক টানা জপ। গুরুভাই নন্দ গোস্বামী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উত্তরীয় নেড়ে হয়তো বাতাস করছে তাকে। নয়তো মাছি তাড়াতে। হাসি পেল অসিতের। এখনও প্রসাধন?

প্রসাধনের কথা মনে হতেই অসিতের দৃষ্টিটা ঘুরে গেল রীতার দিকে।

রীতা কোথায়?……কোথায় গেল মেয়েটা? ……

যেন ওর অব্যক্ত জবাব দিতেই কাটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো রীতা।

অবাক কাণ্ড। পরনের শাড়িটাকে বদলাতে গিয়েই হালকা গোলাপী রঙের ফিনফিনে একটা শাড়ীপরে সে এবার ভদ্র আধুনিক ছাঁদে। তার সংগে কালো ব্লাউজ একটা। ব্লাউজ নয়। যেন মাত্র চারটি একগজী চওড়া কালো ফিতে গুণের চিহ্নের মতন আড়াআড়ি ভাবে প্রখর করে তুলেছে পূর্ণ যৌবনের সমৃদ্ধ বরাংগের আনিবর্তটাকে।

হাতে নিয়ে ফিরছে ছাড়া শাড়ী ব্লাউজ। পায়ে হাঁটছে না। যেন স্টেজের ওপর অদৃশ্য এ্যাকট্রেস ছন্দে ছন্দে নেচে এগুচ্ছে।

চোখাচোখি হল অসিতের সঙ্গে।

অর্ধ-অনাবৃত দেহে ছন্দোময় একটা বিশাল হিল্লোল তুলে হাসলো রীতা। যেন হাসির হাতছানি দিয়ে ডাকলো। তাতেও অসিতের দিক থেকে কোনও রকম সাড়া না পেয়ে এবার সে সত্যিই হাতছানি দিল। বারবার।

সহসা বাধা পড়লো সেই মূকাভিনয়ে।

দূর থেকে ভেসে এলো পুরুষালী হাস্যরব।

এক সংগে ওরা ছ'জনেই ফিরে তাকালো সেই দিকে।

হাসছে রোভার রীতার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

রীতার দিকে এবার সে ছু'আঙ্গুলে ধরে বাতাসে ছুঁড়ে দিল একটা চুমা।

আশ্চর্য !

রাগ করলো না রীতা মোটেই। বরং হাসতে হাসতে সে যেন বাতাস থেকে চুমাটাকে আলগোছে লুফে নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে একটা পায়ের ভরে একটা চর্কি পাক ঘুরে নিল। তারপর বিনিত কায়দায় কোমর ভেঙে সামনে ঝুকে রোভারকে অভিবাদন জানাবার চেষ্টা করতেই কাঁধ থেকে তার খসে পড়লো আলতো আচলটা।

প্রখর দিবালোকে প্রকট হয়ে উঠলো তার স্বল্পাচ্ছাদিত মাংসল আধাবর্তের স্বর্ণচূড় গিরিশ্রেণী, গিরিপথ, খাল, সমতল।

আর পারলো না রোভার ছুটে যেতে চাহিল সে রীতার দিকে। হাত ধরে তাকে বাধা দিল কোলম্যান। ধরে টানা ছোড়া চললো ওদের।

অপার কৌতুক হেসে ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগলো রীতা সেন।

মুখ ফিবিয়ে নিল অসিত।

সরোজলাল এখনও ভাবছে।

অসিত বললে—কিছু ভেবে ঠিক করতে পারলে ?

শুকনো জবাব দিল সরোজলাল—আমি অন্য কথা ভাবছিলাম।

কী কথা ভাবছিল সরোজলাল, তা বুঝতে দেরী হলো না অসিতের।

তবু বললো—এখন উপায়?

—ওপরওলা।

—আছেন কি সেখানে কেউ?

—জানিনা। দেখিনি।

—আচ্ছা, আমাদের সামনে গৌহাটি আর পেছনে ডিব্রুগড় দুইই তো এখান থেকে শখানেক মাইল হবে?

—প্রায়।

· কোনদিকের পথটা ভাল?

—পথ কোনদিকেই নেই। তবে গৌহাটির দিকটায় তবু খানিকটা সমতল মিলবে। কিন্তু পেছনে ডিব্রুগড়ের দিকে শাখ-প্রশাখা নিয়ে বিরাট পাঁচিল বন্ধ হয়ে পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে মিকির পাহাড় আর নাগাপাহাড়। দক্ষিণে শিলচরের দিকেও খাঁচার আর একদিকের বন্ধ দরজার মতন ওদের সংগে যোগ দিয়েছে চরাইল পাহাড়।

এতসব শুনেও অসিত হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলো—আচ্ছা হেঁটে পার হওয়া যায় না এখান থেকে গৌহাটি পর্যন্ত পথটা?

হো হো করে হেসে উঠলো এবার সরোজলাল। যেন ছেলেমানুষের মুখে একটা মজাদার বুলি শুনেছে।

· হেঁটে পাড়ি? এই জংগল দিয়ে? চার-চারটি মাইলকে নিয়ে? ঐ পা ভাঙা মিসেস্ দেশাইকে কাঁধে তুলে?

আবার কথা হারিয়ে গেল অসিতের। মৌন হয়ে সে বসে রইল ওপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে।

সূর্য উঠেছে মাথার ওপর! খাই খাই করছে প্রচণ্ড দাবদাহ নিয়ে। আকাশটা নীল থেকে পুড়ে পুড়ে তপ্ত তামার মতন হয়ে

উঠেছে। গাছের পাতাগুলো ও যেন সভয়ে স্থির হয়ে গেছে। পূর্বরশ্মি কোটি কোটি থাবার গলিত তামার মতন চকচকে প্রলেপ মাখাতে শুরু করেছে আকাশ ছোঁয়া বৃক্ষশ্রেণীর চূড়োগুলোর।

অতখানি আকাশের কোনদিকে একটা কাক চিল পর্যন্ত উড়ছে না। তারাও যেন ভয় পেয়ে পরিত্যাগ করেছে এই আদিম পার্বত্য বন্য অঞ্চলটাকে। শিউরে উঠে চোখ জানালো অসিত।

রণজিৎ আর লতিকা এবার ছায়া ঘেঁষে পা ছড়িয়ে বসেছে একটি গাছের মোটা গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে।

রণজিৎ কি যেন বলছে। লতিকা একটা ঘাসের শিষ দাঁতে কাটতে কাটতে শুনছে।

আবার সেই পুরানো অস্বস্তিটা মাথা চড়া দিয়ে উঠতে চাইল অসিতের মধ্যে।

লতিকার সঙ্গে পূর্ব পরিচয় না থাকলেও অসিতের কিন্তু আবার মনে হোল সে যেন ওর চেনা। বিশেষ করে ঐ মুখখানা আর থেকে থেকে মরালীর মতন চমৎকার ভংগীতে ওর ঐ ঘাড় ফেরানো, —ওকে যেন কোথায় দেখেছে অসিত।

কিন্তু কোথায়?······ কতদিন আগে? ····· মনে পড়ছে না। কিছুতেই না।

ওঃ একি নিদারুণ অস্বস্তি!

উঠতে হোল অসিতকে। স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক কাঁধ পেতে সে যখন এতগুলো মানুষের দায়িত্ব নিয়েছে, তখন তা সামলাতেও তো তাকেই হবে?

* * * *

পা বাড়াল অসিত ওদের বনদুর্গটার দিকে। অর্থাৎ ভাঙা প্লেনের খোলটার দিকে।

—ও বাবা, শোনো। ডাকছেন বিভা দেবী।

কাছে গিয়ে দাঁড়ালো অসিত।

বিভা দেবী বললেন—একটু গংগা জলের ব্যবস্থা করে দিতে হবে যে বাবা।

—গংগাজল? এখানে?

—হ্যাঁ বাবা। গংগা জল না হলে যে আমার নিত্যপূজা হয় না। তিরিশ বছরের অভ্যেস্। যেখানে যাই, বোতলে করে গংগা জল নিয়ে যাই।

—এবার আনেননি?

—আনিনি কী গো? অত ভুলো মন নাকি আমার।

এনেছিলুম এক বোতল।

—কি হোল বোতলটা?

বিভা দেবীর বদলে এবার জবাব দিল নন্দ গোস্বামী—ফুট করে। মানে ফুটি ফাটা। গংগাজল গড়িয়ে গিয়ে আসামের জংগল উদ্ধার হয়ে গেছে।

বিভাদেবী সেই ধরে বললেন—তাই বলছি বাবা, একটু গংগা-জল যোগাড় করে দাও।

সবিস্ময়ে অসিত বললো—কিন্তু গংগাজল এখানে পাচ্ছি কোথায়?

ধড় পড়িয়ে উঠলেন বিভাদেবী—হ্যাঁ, সেকি গো ছেলে তাহলে আমার পূজো হবে কি করে?

অসিত বললো—যাহোক করে চালিয়ে নিন্।

— অ্যাই, অ্যাই! ঠিক বলেছেন আপনি।

কলকণ্ঠে বলে উঠলো নন্দ গোস্বামী—আমিও এতক্ষণ ধরে ওঁকে ঐ কথাই বোঝাচ্ছিলুম স্যার। মন চাউংগা,—তো কাটৌতিন গংগা। বুঝলেন না তো? মানেটা হোল এই যে মন যদি সাঁচ্চা থাকে তাহলে যে কোনও জলই গংগাজল সমান হয়ে উটতে পারে। নাইবা রহিল গংগাজল? তাই বলে অন্য জলে পূজো হবে না?

—না, হবে না। নন্দকে ধমকে উঠে দরদকণ্ঠে অসিতকে বললেন বিভাদেবী—আনবে না তাহলে গংগাজল ?

বিব্রত হয়ে পড়লো অসিত, কি বলবে সে ওঁকে ? এমন বর্ষিয়সী অবুঝকে সে কি বোঝাবে ?

অসিতকে চুপ করে থাকতে দেখে সেই ফাঁকে নন্দগোস্বামী বলে উঠলো—আচ্ছা, আপনি বলুন তো, গংগাজল ফেলেওনা দিখি, সব জলই কি তাঁর দান নয় ? তাহলে কেন—

কোনটার জবাব না দিয়ে বিভাদেবী এবার বলে উঠলেন—বেশ, আমিও তাহলে বলে রাখছি বাছা, গংগাজল বিনে পূজো যদি বন্ধ থাকে, তাহলে সেই সংগে স্নানাহারও আমার বন্ধ থাকবে। এবার যাও তুমি।

শেষ চেষ্টায় অসিত বোঝাতে চেষ্টা করলো—দেখুন, আপনি বুঝতে পারছেন না কেন—

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—যাক্। তিরিশ বছর যা আমি একটা দিনও পারিনি। আজও আমি তা পারলো না। আমার যে-কথা সেই কাজ। আর আমাকে কিছু বোঝাতে চেওনা বাবা। তার চেয়ে ঐ যে তোমাদের আহ্লাদী ডাকছে তোমাকে, ওর কাছে যাও, ছায়না কায়াগে।

প্রবল বিতৃষ্ণাভরে মুখ ফিরিয়ে ঘুরে বসলেন বিভাদেবী।

তাঁর নির্দেশ মতন ফিরে তাকাতেই অসিত দেখতে পেলো, দূর থেকে রীতা তাকে হাতছানি দিয়ে দিয়ে ডাকছে।

দেখেও সেদিকে যেতে ইচ্ছে হোল না অসিতের। বিভাদেবীর আচরণে তেতো হয়ে উঠেছে তার মন।

কিন্তু ডাকোটাখানার দিকে অসিত ক'পা এগোতেই রীতা এবার নিজেই ছুটতে ছুটতে এসে পথ আটকে দাঁড়ালো।

হাঁকতে হাঁকতে বললো—বাব্বাঃ! ডাকছি তা শুনতেই পান না যে ? পুরুষের এত দেমাক ভাল নয়।

অসিতের কণ্ঠ দিয়ে বাঁকা সুরে বার হয়ে এলো—মেয়েদের বুঝি রূপের চাইতেও দেমাক বেশি হতে হয়?

খেঁকিয়ে উঠল রীতা—আমাকে বলছেন?

—না, কাউকে নয়। কি বলছেন?

—মুস্কিল হয়েছে।

—আমি কি সব্বার মুস্কিল আসান?

—বাব্বাঃ। রাগ করছেন কেন? দেখছি আপনিই সব দেখা-শোনা করছেন তাই বলছি।

—মুস্কিলটা কি?

প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো রীতা সেন—আমার পাউডার ফুরিয়ে গেছে।

— তাতে কি হয়েছে?

—একটু জোগাড় করে দিতে হবে।

বিস্ময়ে হতবাক হবার উপক্রম হলো অসিতের।

এরা সব পাগল না কি? অসিতকে কি ভেবেছে এরা? এই নির্জন বনে কারো ফারমাস হচ্ছে গংগাজলের কারো ফেস-পাউডারের?

বিস্মিত কণ্ঠে বললো—কোথায় পাবো?

—দেখুন না একটু চেষ্টা করে। আরো তো ঐ ওঁরা সব রয়েছেন। ওঁদের কারো কাছে যদি কিছু থাকে।

ঈষৎ তিক্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো অসিত—থাকলেই বা ওঁরা দেবেন কেন? আর আপনি নিজেই চাইলে তো পারেন।

একান্ত বিতৃষ্ণাভরে রীতা বলে উঠলো—ওদের দেমাক আপনার চেয়েও বেশী। দেখতে পাচ্ছেন না, কিভাবে আমাকে এড়িয়ে চলেছে ওরা? এর পরেও ওদের কাছে হাত পাতবো আমি নিজে? প্রাণ গেলেও তা আমি পারবো না।

অসিত বলে উঠলো—আমি ও পারবো না।

—তাহলে কি আমি পাউডার বিনাই এখানে পড়ে থাকবো? ও গড্!

শিউরে উঠে রীতা আবার বললে—না বাবা, না খেয়ে থাকতে পারি, কিন্তু পাউডার টাউডারগুলো ছাড়া একটা বেলাও চলবে না। জংগলে পড়েছি বলে সত্যি-সত্যিই আমি জংলী হয়ে থাকতে পারবো না।

রি-রি করে উঠলো অসিতের আপাদ-মস্তক।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলো—তাহলে খোঁজ করে দেখুন, এখানে কেউ খৈনি খায় কিনা? তাহলে না হয় পাউডারের বদলে তার কাছ থেকে খানিকটা চুন চেয়ে নিয়ে কাজ চালান। কথা শেষে সে আর রীতার উত্তরের জন্যে দাঁড়ালো না। দ্রুত পা চালিয়ে দিল নিজের পথে।

পাচ

পেট বড় দুষ্‌মন।

সেই দুষ্‌মনকেই ভোগ চড়িয়ে ঠাণ্ডা করবার দায়িত্বটাই যেন মহাদায় হয়ে দেখা দিল অসীতের পক্ষে।

এগারোটা পেট।

সহযাত্রীদের কাছ থেকে যা কিছু আহার্য-পানীয় পাওয়া গিয়েছিল, তা সবই একত্র করে নিজের ব্যক্তিগত হেফজতে অসীত যে সব গুদাম তৈরী করেছিল, তা থেকেই সে বুনো-পাতার ঠোঙায় করে দ্বিপ্রাহরিক আহার্য ভাগ করে দিল সবাইকে। নামেই আহার। আসলে গ্রাস দুয়ের বেশী পড়লনা কারো ভাগেই।

ভেবেছিল অসীত, জার্মাণ দুটোর ক্ষিদে বেশী, তাই হয়তো তারাই বেশী গোলমাল করবে। কার্যকালে তা কিন্তু মোটেই ঘটলো না।

সেই ছোট্ট ঠোঙা দুটো হাতে নিয়ে যেন পয়সা প্রাপ্তির প্রসন্নতায় রোভার আর কেলিম্যান দুজনেই সমস্বরে বলে উঠল—ধন্যবাদ।

সুমতী দেবী সেই একই ভাবে পায়ের যাতনা চেপে রেখে স্মিতকণ্ঠে বললেন, আমাকে আবার এই সব কেন দিচ্ছ বেটা? দেখছো তো আমার অসুখ।

অসীত বললো—তাইতো সবচেয়ে জোরালো খাবার আপনারই দরকার। কিন্তু পাচ্ছি কোথায়? তাই ক'খানা বিস্কুট আর এক-টুকরো ডিম।

—তোমরা সব এতগুলো মানুষ আমার ছেলেদের মত, তোমরা সবাইতো খাবে। হয়তো খাবেই পেট ভরবে না। আর আমি হতভাগী শুয়ে শুয়ে ডিম খাবো? তা খাব কেন বেটা?

অসীত বললো—রুগ্না মাকে উপোসী রেখে আমরাই বা কি করে খাই বলুন তো? বাধ্য হয়ে ঠোঙাটা হাতে নিলেন সুমতীদেবী।

তারপর সহসা অতর্কিতে জিজ্ঞাসা করে বসলেন—তোমার মা আছেন বেটা?

এমন একটা প্রশ্নের জন্য মোটেই তৈরী ছিলনা অসীত। বিব্রত হয়ে পড়লো। জবাবটা কিন্তু তাকে মুখ ফুটে দিতে হোল না।

সুমতী নিজেই আবার বলে উঠলেন—বুঝেছি। বেচারা।

চমকে উঠলো অসীত।

গুজরাটী মহিলা সুমতীদেবীর দু'চোখের সস্নেহ দৃষ্টির মাঝে ঝলমল করে উঠতে চাইছে অসীতের হারানো সেই বাঙালী মা.

হয়তো সহ্য করতে পারলো না অসীত। হয়তো বা লজ্জা পেলো।

কাজের ছুতোয় তাড়াতাড়ি সরে গেল সেখান থেকে, রণজিৎ আর লতিকাও হাত পেতে নিল ঠোঙা দুটো, নিল যেন নিতান্ত অনিচ্ছা ভরে, শুধু ভদ্রতা বজায় রাখতে। পরক্ষণেই যেন উপেক্ষা ভরে ঠোঙাটাকে একপাশে সরিয়ে রাখলো লতিকা। যেন ঠোঙাটাকে উপলক্ষ্য করে যেন উপেক্ষাটুকু ছুঁড়ে দিতে চাইল সরাসরি অসীতকেই।

তার দেখাদেখি তেড়ে ফুঁড়ে অসীতকে কি যেন বলতে যাচ্ছিল রণজিৎ সিং।

ত্রস্তে তার একটা হাত ধরে লতিকা বলে উঠলো—না রণজিৎ, একটি কথা নয়। ষ্টপ্, প্লীজ!' বাধ্য হয়ে চুপ করে গেল রণজিৎ। চুপ করে অসীতও সরে গেল তাদের কাছ থেকে। রীতা বসে ছিল একা। ঠোঙা হাতে পেয়ে নাচুনী-কন্যার চোখদুটো যেন নেচে উঠলো। রহস্য ভরে বলে উঠলো—বিশ্রী!

অসীত জিজ্ঞাসা করলো—কি?

রীতা বললো—এই খাওয়ার ব্যাপারটা। এই একটা জায়গা-তেই সভ্য মানুষ আর বুনো জানোয়ারের কোনও তফাৎ নেই। না? খেতেই হবে।

অবাক হল অসীত। একি কথা শুনছে সে এই চটুল নাচুনী কন্যার মুখে? কোথায় পেল ও সভ্যতার শেকড় ধরে নাড়া দেবার এই লজ্জাকর চিরসভ্য উপলব্ধি? সবিস্ময়ে অসীত তাকালো রীতার দিকে।

হাসলো রীতা। চোখের কৌতুক তার সম্প্রসারিত হোল রঙচঙে সারা মুখখানাতে। বললো—এই যে আমি। সেজেগুজে প্রজাপতী হয়ে নেচে বেড়াই, কেন? ঐ পেটের খিদের জন্যে, আর ঠিক ঐ জন্যেই ওমর খৈয়ামের ওপরও আমার ঘেন্না ধরে গেছে।

—কেন?

—আবার কেন? কবিকে উপবনে এনেছেন তিনি। সংগে কি সুরা দিয়েছেন। কাব্যগ্রন্থ দিয়েছেন—চমৎকার একটা রোমান্টিক পরিবেশ তৈরী করেছেন। বেশ লাগছিল। হঠাৎ তিনিও কেনা সেখানে বেসুরো থেতলা ভাবে সেই আদিম জানোয়ারের মতন বলে উঠলেন—"ওতে হবে না। সংগে রবে অল্প কিছু আহার মাত্র।" বিশ্রী। বিশ্রী! একটা থাপ্পড়ে কে যেন চমৎকার একটা স্বপ্ন ঘুচিয়ে দিলে। যেমন শুরু করছিল রীতা, তেমনি আবার থেমে গেল। ঠোঙাটাকে নিয়ে নীরবে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। তারপর হঠাৎ আবার সে কলকণ্ঠে হেসে উঠলো।

বললো—বারে বা! কি মিল দেখেছেন? আমরাও তো সেই উপবন না হোক বনে এসে পড়েছি। সাকী-সখীর অভাব নেই। জলের বদলে সুরা, মানে বীয়ার বানাচ্ছি। মনের মধ্যে কাব্য কি একেবারে নেই? পশু তো নয়। তবু দেখুন। আমরাও সেই আহারের ঠোঙাকে ছাড়তে পারছি কি? পারছি না, পারছি না।

খিল খিল করে হেসে আকুল হোল রীতা।

হাসে আর বলে—সাবাস্ ওমর সাহেব। সাবাস্! তোমাকে আমি চিনতে ভুল করেছিলাম মিঞাসাহেব। তুমি সত্যস্রষ্টা। তুমি ঋষি। তোমাকে লাখো সেলাম করি, লাখো সেলাম।……

মুস্কিল হল সবচেয়ে বিভাদেবীকে নিয়ে।

সাফ শুনিয়ে দিলেন, না খেয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে মরবেন তবু সবার-ছোঁয়া ঐসব মেলেচ্ছ খাবার তিনি মুখে তুলবেন না। প্রাণ যায় তাও স্বীকার, তবুও সেই প্রাণটাকে বাঁচাবার জন্যে জাত-ধর্মকে তিনি জলাঞ্জলি দিতে পারবেন না।

—ঐ খাবারও আমি খাবো না, আর জলের বদলে ঐ মেলচ্ছা-দের মদও আমি ছোঁবোনা।

—কফি?

—তাও না।

অথচ তা ছাড়া উপায় ছিল না। জল ছিল মাত্র তিনটি ওয়াটার বটলে। তা রাখা হয়েছিল আলাদা করে অসুস্থা সুমতী দেবীর জন্যে এবং ভবিষ্যতের আরও জরুরী প্রয়োজন বাবদ।

হার মেনে শেষ পর্যন্ত নন্দ গোস্বামীকে সংগে করে এনে অসীম তার হাতে তুলে দিল সেই বিশেষ সঞ্চয় থেকে একটা পাত্রে করে আধ বোতল জল।

বললো—ওঁকে দেবেন। এই প্রথম, এই শেষ। আর জল পাবেন না উনি। মরে গেলেও না। ইচ্ছে হয়। গোঁড়ামী ছেড়ে বীয়ার নিতে পারেন। বুঝিয়ে বলবেন ওঁকে।

নন্দ বললো—বলতে হবে না। নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি বীয়ার উনি মরে গেলেও গিলবেন না। অমন এক কথার মেয়ে-গোঁয়ার আমি আর দুটি দেখিনি।

—আপনারও কি ওঁরই মতন গোঁড়ামী আর শুচিবাই আছে নাকি?

হেসে উঠে নন্দ গোস্বামী উত্তর দিল—আজ্ঞে না। আমি

পরিচয় আমার নামই প্রকাশ। যখন যা দেবেন তাতেই আমার আনন্দ।

তবু নন্দীকে বিদায় দেবার আগে অসীত চুপি চুপি তার হাতে বিভাদেবীর ঠোঙাটা আবার তুলে দিয়ে বললো—নিয়ে যান। এখন না হোক্, পেটের দুষমণটা যখন ওঁর জোর উৎপাত সুরু করবে তখন হয়তো দরকারে লাগতে পারে।

প্রতিবাদ করলো না নন্দ গোস্বামী। লুকিয়ে নিয়ে গেল ঠোঙাটাকে।

প্রায়-আহার্য-মাঝে আহার পর্ব সমাধা করাতে গলদঘর্ম হয়ে গেল অসীত।

তারপরেই অসহ্য গরম সহ্য করতে না পেরে সবাই ছায়া দেখে বড় বড় গাছের তলায় শুধু ঘাসের ওপর অবসন্ন বিপর্যস্ত দেহটাকে এলিয়ে দিলো বিশ্রামের আশায়। বিশ্রাম কিন্তু ঘটলো না কারও অদৃষ্টে। অসহ্য গরমে আর অতৃপ্ত তৃষ্ণায় সবাই ছটফট করতে লাগলো। তারপর নানান ধরণের মাছির উপদ্রব ওদের অতিষ্ঠ করে তুললো। প্রখর সূর্যালোক থেকে চোখ দুটোকে রেহাই দেবার জন্যে চোখের ওপর রুমালটাকে চাপা দিলো।....

অসীত ছায়া দেখ একধারে সবার কাছ থেকে অনেকটা দূরে আলাদা হয়ে ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে ছটফট করছিল। খানিক পরে একটা সিগ্রেট ধরালো সে।

তারপর.......

ছয়

হৈ-হৈ শব্দটা কানে যেতেই ঘোরটা কেটে গেল অসীতের।

অভ্যাস মতন হাত ঘড়িটায় নজর পড়তে অবাক হোল অসীত। পাঁচটা বেজে গেছে। সূর্যের তাপ কিন্তু তখনও কমেনি।

গরম আর মাছির উপদ্রব তুচ্ছ করে কখন একসময়ে ক্লান্তিভরে অসীত যে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তা টেরই পায়নি। এতক্ষণ ঘুমিয়েছে? পৌনে দু'ঘণ্টা?

দেখলে, সবাই জেগে উঠেছে। কেউ উঠে বসেছে, কেউ বা অলস ভাবে চোখ চেয়ে শুয়ে আছে কিংবা গাছে ঠেস দিয়ে ঝিমুচ্ছে আধ শোয়া হয়ে।

কর্মব্যস্তা একা শুধু বিভাদেবী। চোখ বন্ধ করে যথারীতি জপকরে চলেছেন তিনি, বাকি সবার চোখের দৃষ্টি একই দিকে নিবদ্ধ। লক্ষ্য বস্তু তাদের এক প্রান্তের একটা গাছ।

হৈ-হৈ-টা এই সময়ে আবার কানে এলো অসীতের, সবার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে এবার সেও তাকালো গাছটার দিকে। সম্ভিত হোল।

গাছটার নিচু একটা ডালে দুপাশে পা ঝুলিয়ে বসেছে রীতা। জমিতে দাঁড়িয়ে ডালটাকে নুইয়ে থামিয়ে থেকে থেকে ছেড়ে দিচ্ছে রোভার। স্প্রিং-এর মতন রীতাকে নিয়ে নাড়া খাচ্ছে ডালটা। সংগে সংগে হাসতে হাসতে ককিয়ে উঠেছে রীতা কচি মেয়ের মতন। হাসছে রোভার ও পরমানন্দে প্রাণখুলে।

যেন একটা মজার খেলা পেয়েছে ওরা পিকনিকে এসে। ওদের চারিদিকে যেন আরকেউ নেই। তাই ওরা সীমাহীন ভাবে হয়ে উঠেছে নিংশঙ্ক নিলাজ। ভদ্রতা অথবা শালীনতার প্রশ্ন তাই যেন

ওদের কাছে এখন একান্তই অবান্তর। সহসা ঘটে গেল আর একটা অবিশ্বাস্য কাণ্ড।

জপ বন্ধ করে চোখ মেলে তাকালেন বিভা দেবী। তারপর কারও দিকে দৃষ্টিপাত পর্যন্ত না করে সটান গটগটিয়ে তিনি হাজির হলেন রীতা আর রোভারের কাছে। বিন্দুমাত্র ভূমিকা না করে তিনি চড়া গলায় হুকুমদারী করলেন—এই ঢলানী! নেমে আয়।

এহেন অমার্জিত সম্বোধন আর কড়া হুকুমের জন্যে তৈরী ছিল না রীতা। তাই শাখারূঢ় থেকেই সেও চড়া জেরা চালালো—কেন নামবো? তোমার হুকুমে?

—হাঁ লো, হাঁ। তাই নামবি।

বিদ্রোহী হয়ে উঠে রীতা বললো—নামবো না। কখনো না।

—তোর বাপ্ নামবে লো লাজ-লজ্জার—মাথাখাকী!

সাপের পাঁচ পা দেখেছিস, না? লঘু গুরু জ্ঞান নেই? আহ্লাদীর ন্যাকামির ঠ্যালায় একটু জপ পর্যন্ত করার যা নেই! বলি কি লো! ভালয় ভালয় নামবি না খেঁটে—খ্যাংরা ধরবো?

বলতে বলতে অগ্নিমূর্তি হয়ে একটা শুকনো মোটা ডালকে লাঠির মতন উঁচিয়ে ধরে রুখে দাঁড়ালেন বিভাদেবী। পড়লো বুঝি ঘা কতক রীতার উপর।

ভয়ে চিৎকার করে উঠলো রীতা।

ভিনদেশী রোভার হয়তো শান্তশিষ্টা জপরতা বাঙালী প্রৌঢ়াটির আকস্মিক এহেন রঙ্গরংগিনী রূপান্তর দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। এমন লাঠি সঞ্চালনের সমূহ বিপদের কবল থেকে তার বনলতা সংগিনীকে বাঁচাবার জন্যে চকিতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বিভাদেবীকে বাধা দেবার চেষ্টা করে বলে উঠলো—হেই রোক্কে!

—চোপ্‌রও লালমুখে ন্যাংটা কাঁহকা। ভেবেছ বুঝি এ তোমাদের সেই মেলেচ্ছ মুলুক হ্যায়? মানুষ জনের চোখের ওপর দিনদুপুরে যাচ্ছেতাই বেলেল্লাগিরী করে গা? আর যদি একটি ট্যা ফোঁ করো

তো এই খেঁটের ঘায়ে এমনি বদন বিগড়ে দেগা যে মুলুক্কে ফিরলে তোম্‌কো গর্ভধারিণী মা অব্দি চিনতে নেহি পারে গা। বুঝেছ হ্যায় ?

বুঝতে নিশ্চয়ই দেরী হোল না রোভারের। অমন জোয়ান জার্মান বাচ্চাও বোবা হয়ে গেল।

ঠিক সেই সময়েই ছুটে এলো কেলিম্যান।

কিছু না বলেই সে ঠাস্‌ করে বসিয়ে দিল রোভারের গালে প্রচণ্ড একটা চড়। রুখে ঘুসি তুলতে যাচ্ছিল রোভার কিন্তু দেখলো তার আগেই ঘুসি বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেলিম্যান। যুধ্যমান দুই মল্লবীরের মতন দুই জার্মানে দুচোখ স্থির জ্বলন্ত শিখা নিয়ে ক্ষণেক তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে। যেন মুহূর্তে দুজনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে দুজনকেই। কিন্তু কিছুই ঘটল না তেমন।

সহসা ঘুষি ছেড়ে পাকানো মুঠো খুলে ডান হাতটা কেলিম্যান বাড়িয়ে দিল রোভারের দিকে। রোভারও পরম আন্তরিকতায় হাত মেলালো। সন্ধি হয়ে গেল ওদের। হাত ধরা-ধরি করে নিয়ে যাচ্ছিল দুজনে। ডালের ওপর থেকে ককিয়ে উঠলো রীতা—এই, আমাকে নামিয়ে দিয়ে যাও। ফিরে দাঁড়ালো ওরা : লাফ দাও।

বৃক্ষরুদ্ধা শিউরে উঠলো—না ঠ্যাং ভেঙে যাবে।—

কিছু হবে না। লাফ দাও। দাও।

সবল দু'টো বাহু ওপর দিকে তুলে ধরলো রোভার, মরি-বাঁচি করে ওপর থেকে ঝাঁপ খেয়ে চৌচাপটে রোভারের বুকের ওপর এসে পড়লো রীতা। হালকা একটা পালকের মতন তাকে অনায়াসে লুফে নিল রোভার, তারপর মাটিতে নামিয়ে দিয়ে সে ফিরে চললো হাসতে হাসতে কেলিম্যানের সংগে হাত ধরা ধরি করে।

গর্জে উঠলেন বিভাদেবী—মর্ মর্ কালামুখী থুথুতে ডুবে মর

ফুসিয়ে উঠলো রীতা এবার—কেন, মরবো ? কি করেছি আমি ?

বিভাদেবী বললেন—নেকু খুকু! বেজাত ঐ মেলেচ্ছ বিনে কেলেংকারী করার আর বুঝি পুরুষ জুটলো না? আর তাই বা কেন শুনি? মেয়ে মানুষ। মেয়ে মানুষদের সংগে থাকতে পারিস নে?

—না পারিনা! গর্জে উঠলো রীতা—তোমরাই বা আমাকে সহ্য করতে পারো না কেন শুনি? মেয়ে-পুরুষ কেউ না। তাই আমারও যা খুশি তাই করবো। যার সংগে খুশি কেলেংকারী করবো। বেশ করবো।

কথাগুলো টিপ্ করে করে বিভাদেবীর মুখের ওপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়ে বিজয়িনীর মতন ঘাড় উঁচু করে রীতা ফিরে চললো নিজের কোণ টুকুর দিকে।

পিছু পিছু বিভাদেবীও চললেন গজগজ করতে করতে—তপ্ত লোহা পুড়িয়ে পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিলে যেমন হয় তেমন চেহারা ধিংগী মেয়ের সর্ব্বাংগে! আমার মেয়ে হলে ছাই পেড়ে খাওয়াতুম, নোড়া দিয়ে থেঁতলাতুম! বাছা বাছা অশাস্ত্রীয় শাস্তির উল্লেখ করতে করতে ধর্মপ্রবনা বিভাদেবী গিয়ে ধপ করে বসে পড়লেন নিজের জায়গায়।

নন্দ গোস্বামী তাঁকে শান্ত করার জন্যই বোধ হয় বলে উঠলো —যেতে দাও, ছেড়ে দাও ওসব ঝুট-ঝামেলা।

প্রবল মুখ ঝাপটা দিয়ে উঠলেন বিভাদেবী—হ্যাঁ, তা আর নয়? কিছু বলবো না, মুখ বুজে থাকবো। আর তোমরা সবাই মিলে যা খুশি করে যাবে। কেমন? ধরে-বেঁধে অখাদ্য গেলাতে চাইবে! চোখের ওপর সাত রাজ্যির যত সব নোংরা দৃশ্যর হাট বসাবে। কেন?

কেন'র জবাব দিল না নন্দ গোস্বামী। হয়তো বুদ্ধিমানের কাজই করলো।

বিভাদেবী তাঁর জপের মালা হাতে তুলে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে

আবার চোখ বুজলেন। বাধাহত জপ তার আবার পুরোদমে শুরু হয়ে গেল।

দেখা গেল, রীতাসেনও অলস হয়ে বসে নেই। ছোট্ট হাত আর আরসিটাকে সামনে ধরে একমনে সে মেরামত চলেছে তার মুখের রঙকাম।

ওধার থেকে মন্থর পায়ে এবার উঠে এসে সরোজলাল বসে পড়লো অসিতের পাশে।

ক্ষণেক চুপ করে রইল। তারপর বললো—কেমন বুঝছেন?

অসিত উত্তর দিল কিছু বুঝতে পারছি না। জানিনা, শেষ পর্যন্ত কি আছে কপালে? দিনটা তবু একরকম গেল। কিন্তু এই বিজন বনে অকন্ধার রাতটা যে কি করে কাটবে এতগুলো মানুষকে নিয়ে?

—পুরে দেবেন সবাইকে প্লেনের সেলের মধ্যে।

—গরমে সেদ্ধ হয়ে মরে যাবে যে।

বিচিত্র হেসে সরোজলাল বললো—মানুষ অত সহজে মরে না মিঃ বসু। তাছাড়া রাত থেকে ঠাণ্ডা পড়বে। আর প্লেনটাকে ঘিরে কাছে দূরে দু-চারটে আগুনের ধূনিও জ্বেলে রাখতে হবে।

—জন্তু জানোয়ারে হামলা করবে নাকি রাত্তিরে?

—সাবধানের মার নেই। সাপ-খোপও তো তাড়াতে হবে? অবিশ্যি চাঁদ উঠবে রাতে। কিন্তু সে তো রাতের কথা। এখন যে ওদিকে --

অারব্ধ কথাটাকে বন্ধ করে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সরোজলাল ফিরে তাকালো দেশাই দম্পতির দিকে। অসিতও তাকালে সেদিকে। বললো—কি হয়েছে?

—দুপুর থেকে পায়ের যন্ত্রণাটা বেড়েছে আপনার মার।

—আমার মা! সবিস্ময়ে তাকালো অসিত সরোজলালের দিকে।

ঠোঁটের ওপর এক ঝলক অভয়-স্মিত হাসি ফুটিয়ে সরোজলাল বললো—আমি জানি মিঃ বসু। আমার উপায় নেই, নৈলে অসিত ওঁকে মা—বহিন যা হোক একটা কিছু বলে ডাকতাম। দুপুর থেকে ছট্‌ফট্‌ করছেন। একটু শেক দেবার ব্যবস্থা করতে পারলে হয়তো আরাম পেতেন।

কথাটা শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠতে যাচ্ছিল অসিত। হাত টেনে বাধা দিল সরোজলাল।

বললো—আপনি গেলে হবে না। আপনার সেবা উনি নেবেন না।

অসিত জিজ্ঞাসা করলো—কেন? ছেলে হয়ে মার সেবা করতে চাইলেও কি—?

—সেই জন্যেই তো আরো নেবেন না। নিজের জন্য কোনও মা-ই ছেলেকে কষ্ট দিতে চান না। তাছাড়া এহোল মেয়েদের কাজ।

—কিন্তু কোন্ মেয়েকে বলবো আমি এখানে? মান-অপমান সব ছেড়ে কে নেবে ওঁর পদসেবার ভার?

মুখে কথার জবাব দিল না সরোজলাল। ফিরে তাকালো এবার সে দূরে উপবিষ্টা লতিকার দিকে।

সব দ্বিধা ছেড়ে দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে সোজা গিয়ে অসিত দাঁড়ালো লতিকার সামনে। চোখ তুলে রণজিৎ আর লতিকা দুজনেই তাকালো ওর দিকে।

রণজিৎ বললো—ইয়েস্ প্লীজ মি! বসু?

তার কথায় ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে অসিত ডাকলো—লতিকা দেবী!

ভ্রূ-কুঁচকে জিজ্ঞাসু চোখদুটোকে লতিকা তুলে ধরলো অসিতের দিকে।

অসিত সরাসরি পেশ করে বসলে প্রস্তাবটাকে।

তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়তে যাচ্ছল রণজিৎ সিং।

তার আগেই কিন্তু দাঁড়িয়ে উঠে লতিকা বললো—চলুন।

সুমতীদেবীর কাছাকাছি হয়ে মৃদুকণ্ঠে লতিকা বললো—আমি ওঁকে দেখছি। আপনি আগে একটু আগুনের ব্যবস্থা করুন। আর একটু গরম কাপড়ের টুকরো যদি পান, খুব ভাল হয়।

আগুনটা জ্বেলে দিয়ে গরম কাপড়ের সন্ধানে অসিত ঢুকলো প্লেনটার গহ্বরে। পেয়েও গেল। প্লেনটার ভিতরাংশে ভাল ফ্ল্যানেলের লাইনিং ছিল। সেই রাজবেশ এখন বিবর্ণ ফালা ফালা হয়ে ঝুলছে। তারই খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে এলো অসিত।

দেখলো, কোন্ ফাঁকে নন্দ গোস্বামীও এসে ভিড়ে গেছে সেখানে।

অসিত কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই সে কৈফিয়ৎ পেষ করে বললো—যত্র জীব, তত্র শিব। কাশী-কামাখ্যা-কালীঘাটে মাথা ঠুকে মরি শিবানীর দর্শন লাভ করে করে পূণ্যি কুড়োবার আশায়। এমন জ্যান্ত আর আর্ত শিবানীর সেবা করার পূণ্যি হাতে পেয়েও কি আর ছাড়ি আমি? করতে লেগেছি। বাধা দেবেন না মশায়। পূণ্যাচরণে বাধা দেবেন না। মহাপাপ হবে তাহলে আপনার।

অবাক হোল অসিত।

আরো অবাক হোল যখন তার কানে এলো লতিকার কথা।

শুনতে পেল, সুমতীকে বলছে সে—বাঃ! বেশ করবো, কেন, করবো না কেন? পথে ঘাটে আমাদের বুঝি মা-মামীমা কুড়িয়ে পেতে নেই? আচ্ছা আচ্ছা, বেশ তো। কথা দিচ্ছি এই আপনার পায়ে হাত দিয়ে। আমার যখন খুব অসুখ করবে। তখন টেলিগ্রাম করে আপনাকে ধরে আনবো। আপনি ছাড়া তখন আর কারো সেবা নেবো না আমি। ব্যস্ এবার হোল তো?

কী বললেন সুমতীদেবী। তা শুনতে পেল না অসিত। তবে বুঝতে পারলো যে তিনি হার মেনে আত্মসমর্পন করেছেন ঐ মাদরাজি কন্যার কবলে।

নিশ্চিন্ত হয়ে ওদের দুজনের হাতে সুমতী দেবীকে সঁপে দিয়ে অসিত ফিরে এলো আবার সরোজলালের পাশে। বসে রইল দুজনেই চুপ করে। দুজনেই একই লক্ষ্য বস্তুর দিকে তাকিয়ে।

—কি ভাবছেন?

সহসা প্রশ্নটা কানে যেতেই চিন্তাহত অসিত ফিরে তাকালো সরোজলালের দিকে।

সরোজলাল যেন তার মনের ধাঁধাটার জবাব দিতে নিজেই আবার বলে উঠলো—ওরা মহামায়া। ওরা মহাশক্তি। ওদের তাই শক্তিরও অন্ত নেই। আর মায়ার খেলায় ক্ষণে ক্ষণে রূপ পালটানোরও সীমা নেই। অবাক হবেন না।......

সাত

রাত নামলো।

ভাঙা ডাকোটাখানার মধ্যে সবাই আবার জড়ো হলো ঠাঁসাঠাঁসি করে। মেয়েদের ছেড়ে দেওয়া হোল একটা দিক—প্রায় আধখানা। খালিটুকুর মধ্যে সাতজন পুরুষ।

বাইরে আবছা চাঁদের আলো। ছটা ধুনি জ্বলছে আশপাশে। তবু অন্ধকার। ফাঁক টুকুতে যতটুকু আলোয় প্রলেপ, তার বাইরে ঘন গাছপালার নিবিড়তার মাঝে তার লক্ষগুণ নিশ্চিদ্র জমাট আঁধার। সেই আধার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে অভিশপ্ত কৃষ্ণ পাষাণ হয়ে। স্তম্ভিত আঁধার। তবু যেন ধক্ ধক্ করছে তার হৃৎস্পন্দন অনড়, তবু জীবন্ত। সারা অংগে কোটি কোটি জেনাকি করে বিচিত্র নকসা।

সেই অবর্ণনীয় আধারের সংগে মিতালী পাতিয়েছে আশ্চর্য নিস্তব্ধতা। নিঃশব্দ যে এত নিথর হয় তা জানা ছিল না অসিতের। অন্ধকার মাটি থেকে আকাশ আর দিক থেকে দিগন্তর ছেয়ে গেছে। ভরে গেছে সেই অভেদ্য প্রগাঢ় নিস্তব্ধতায়।

নিখিল সৃষ্টি বারবার যেন ভয় পেয়ে সহসা মূক হয়ে গেছে।

থেমে গেছে মহাকাশ সেখানে এসে, জমে অসাড় হয়ে গেছে। ঝি-ঝি ডাকছে। কোটি কোটি ঝি-ঝি'র সমন্বয় উঠছে। তবু সে যেন শব্দ নয়। সে যেন সেই গভীর আঁধার আর নিঃশব্দের বিচ্ছুরিত অশান্ত ক্রন্দসী। তার অন্তরঙ্গতায় অব্যক্ত হাহাকার।

সে এক অপূর্ব পরিবেশ। রহস্যময় ভয়ংকর। আবার নিঃসীম উধাও। ভয় হয়। অবাকও হতে হয়। সহ্য করতে পারা যায় না। কিন্তু ছেড়ে যাওয়ার সমর্থ হবে না। নিবিড় বনের সেই স্তম্ভিত নিঃশব্দে কালো আঁধার যেন ভয়ংকর একটা

কালনাগ। বিষাক্ত, অথচ সম্মোহক। ভীতিপ্রদ আর চমক-প্রদ। কুণ্ডলী পাকিয়ে ওৎপেতে পড়ে আছে নিঃশ্বাসে বনস্থলীকে বিষকালো করে।

নড়ছে না। নিঃশব্দ প্রতিক্ষায় জোনাকীর চোখ সন্ধানা আলো জ্বেলে দিয়েছে শিকারের সন্ধান এনে দিতে। জাগবে যখন, গা ঝেড়ে দেবে। মূহূর্তে ঘটে যাবে সর্বগ্রাসী মহাপ্রলয়।

অসিত চেয়ে রইল কাঁচের জানালার ভিতর দিয়ে। দেখবে দুচোখ মেলে। অনুভব করলো রন্ধ্রে রন্ধ্রে তন্ত্রীতে স্নায়ুতে। অসহায়। একান্ত অসহায় ওরা ঐ নিকষ আধার আর নিশ্চিদ্র নিঃশব্দের কাছে। সিন্ধুর কাছে বিন্দু যেন।

বিস্মিত হোল অসিত। তারপর স্তম্ভিত। সবশেষে শিহরিত —মাতাল।

ঘুম নেই অসিতের অপলক চোখে। ঘুম নেই আরো অনেকের চোখে। বসে ঢুলছিল কেউ কেউ। সেই ঢুলুনি থেকেও তারা চমকে চমকে উঠতে লাগলো সুমতীদেবীর চাপা কাৎরাণিতে, কখনও বা বনের গভীরে বুনো জানোয়ারের হুংকারে। তার ওপর আবার তেমনি অসহ্য গুমোট গরম।

পাশ থেকে একসময়ে ফিস্‌ফিস্ করে সরোজলাল বললো—দেখবেন না অমন করে।

—কেন? সবিস্ময়ে জানতে চাইল অসিত।

রহস্যময়ভাবে ফিস্‌ফিস্ করে আবার বললো সরোজ লাল—নারীর মায়া কাটে, কিন্তু জংগলের মায়ায় একবার পড়বে তার আর মুক্তি নেই। যাদু আছে ওর আধারে যাদু আছে স্তব্ধতায়। এ যাদু কাটানোর—মন্তর আজো কেউ খুঁজে পায়নি। উর্বশী—মেনকা হার মানে রাত-কি মোহিনী বনানীর কাছে।

মনে মনে স্বীকার করলো অসিত—সত্যি, খুব সত্যি সরোজ লালের কথা।

মাঝ রাতের পর থেকে ঠাণ্ডা আসতে লাগলো। ভোরের আগে আবহাওয়া দাঁড়ালো চমৎকার আরাম প্রদ। নাতিশীতোষ্ণ। সুখকর। ঘুম পাড়ানী।

শুয়ে বসে একে একে ঢুলে পড়লো সবাই। ঘোর-ঘোর আচ্ছন্নে চুপ হয়ে রইলেন সুমতীদেবীও। ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ প্রতি ধ্বনিত হতে লাগলো সেই বদ্ধ খোলের ভিতর। ঘুম এলো না শুধু অসিতের চোখেই। একই ভাবে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে।

মাথার মধ্যে চলছে অসংখ্য ভাবনার অবিরাম আনা গোনা আর হিজিবিজি জাল বোনা। কতদিন পড়ে থাকতে হবে এমনি-ভাবে এই বনের মধ্যে? মুক্তি আসবে কোন পথে? কী করে? কী করে বেঁচে থাকবে মানুষগুলো অন্ন বিনে, জল বিনে? খিদে হয়ত তবু সহ্য হয় একটা দিন। কিন্তু তৃষ্ণা মেটাবে কি দিয়ে? জল কোথায়? বীয়ার? ওতে গলা ভেজে, ভারতবাসীর তৃষ্ণা মেটে না। তাছাড়া ঐটুকু সঞ্চয়েই বা এতগুলো মানুষের কদিন চলবে?

খোঁজ নিয়েছিল অসিত সরোজ লালের কাছে।

সরোজ লাল বলেছে যে, খোঁজ করলে দু'চার মাইলের মধ্যে জল হয়ত দু'এক ফোটা মিলতে পারে। বন্ধ্যা জল। জল তার শুধু দুষিতই নয়। মারাত্মক ভাবে বিষাক্ত। নদী-ঝর্ণা অনেক দূরে।

তাহলে উপায়?

আচ্ছা, অভাবিত এমন কিছু ঘটে যেতে পারে না যাতে রাত্রি প্রভাতেই ওরা মুক্তি পেতে পারে এই বিজন বনস্থলী থেকে? আবার ফিরে যাবে লোকালয়ে? দেখতে পারে যত কিছু আহার্য-পানীয়? বাঁচবে ওরা আবার সহজ স্বাভাবিক বিশ্বজোড়া মানুষের মতন? ঘটবে না তেমন কিছু অভাবনীয় অলৌকিক ঘটনা? কি ঘটতে পারে? কিছুই ভেবে পায় না অসিত। কিছু না। কিছু না।

আশা করতে সাহস হয় না অসিতের। নিরাশ হতেও রাজি
। বিচিত্র মর্জি মনের।

রবিনশন্ ক্রুশোর পুরোনো গল্পটা বারবার মনে পড়ছে। শ্বাম্বিত হতে উৎসাহ দিতে চাইছে দিশী ভিন-দেশী নানা গল্প উপন্যাস আর সিনেমার কাহিনী। সেগুলো পড়েছে আর ৰের পর্দায় দেখেছে অসিত। রোমাঞ্চিত হয়েছে বিপদের মুখোমুখি ড়িয়ে অ্যাড্‌ভেন্‌চারের মাতাল মোহে।

নিজেকে সেইসব বিচিত্র পরিস্থিতির অদ্ভুতকর্মা নায়ক কল্পনা ়ের পুলকিত হয়েছে! অথচ সেই গল্প আজ যখন সত্যি হয়েছে ।বনে, তখন একটাও কিছু তেমনি অদ্ভুতকর্ম করতে পারছে অসিত: পারছে না হাজার হাজার সমস্যার একটারও সমাধান ৱতে।

গল্পের নায়ক নিদারুণ রূঢ় বাস্তবের কাছে হার মেনে মুখ কয়েছে লজ্জায়। মনের মধ্যে কোথাও অসিত আর সেই রূপ- ার রাজপুত্তুরটাকে খুঁজে পাচ্ছে না।

সুদীর্ঘশ্বাসে আপনা আপনিই গভীর হতাশায় বারবার মাথা ড়লো অসিত।

পারবে না, এতগুলো মানুষের ভার নিয়ে তাদের বাঁচাবার স্ত উদ্ধারের জন্য সত্যিকারের কিছুই করতে পারবে না অসিত- বু। তবু……

একটা কাজ কিন্তু আগামী কাল ওদের করতেই হবে।

এমনি ভাবে এইটুকু ঘোলের মধ্যে এতগুলো মানুষের রাত টানো অসম্ভব। কটা রাত জেগে জেগে বসে কাটাবে? ঘুম ন আসবে, মানবে না সে কোনও বাঁধা। কোনও সংস্কার।

এখন? কোথায় শোবে কে? জায়গা কোথায় এগারোটা ষের হাত-পা ছড়াবার?

তাছাড়া-হোলই বা সভ্যতার বাইরে বিজন বন—সভ্য

মানুষের সংস্কার যাবে কোথায়? মহিলাদের আব্রুর মর্যাদা তো দিতেই হবে?

সরোজ লাল আশ্বাস দিয়েছে যে বুনো জানোয়ারেরা সাধারণতঃ এতগুলো মানুষের উপর চড়াও হতে চাইবে না। বিশেষতঃ যদি সারা রাত ধুনি জ্বালিয়ে রাখা হয়। প্রাণের ভয় জানোয়ারদেরও আছে। মানুষকে ভয় পায় জানোয়ারেও।

তাই ওরা পরামর্শ করে ঠিক করেছে যে, আগামী কাল ওরা প্লেনের গা ঘেঁষে বুনো ডালপালা আর লতা দিয়ে হাত তুই উঁচু অথচ চওড়া মাচা বানাবে। সেই মাচার ওপরে ছড়িয়ে পড়বে পুরুষেরা। মহিলারা থাকবে প্লেনের খোলে।

ধুনি জ্বলবে সারারাত। তু'একটা বাড়িয়ে দিলেও চলবে।

তাছাড়া পালা করে এক একজন পাহারা দেবে। রিভলবার আছে তুটো ওদের কাছে। একটা ঐ জার্মানদের। আর একটা অসীতের নিজের। তাই নিয়ে পাহারায় থাকবে—।

মরতে যদি হয়ই, তাহলে এমনি অন্ধকূপের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে গাদাগাদি করে মরা কেন? একটু হাত-পা ছড়িয়ে শেষ নিঃশ্বাসের ব্যবস্থা হোক।

তারপর?···

তারপর যা আছে অদৃষ্টে, তাই হবে। আর ভাবতে পারছে না অসীত।

—শুনছেন?

ফিস্ ফিস্ ডাকটা শুনে চমকে ফিরে তাকাল অসীত। গড়াতে গড়াতে কখন যেন নিঃশব্দে পাশে চলে এসেছে রীতা। বিশ্রস্ত বেশবাস। সেই আবছা আঁধারেও তাকানো যায় না।

চোখ ফিরিয়ে নিল অসীত। আপনা থেকেই তার মুখ দিয়ে বার হয়ে গেল—তুমি ঘুমোও নি?

তেমনি চাপা গলাতেই সহর্ষে কঁকিয়ে উঠলো রীতা—বাঁচলুম!

বাবা! তবু যা হোক এই রাত দুপুরেও সবার কান বাঁচিয়ে চুপি চুপি আপনার মুখ দিয়ে "তুমি" বেরোল। প্লীজ অসীতবাবু, সবার সামনে তুমিটাই বজায় রাখবেন! কিছু মনে করবো না আমি।

অন্যমনস্কে যে-ডাক অসীতের মুখ দিয়ে বার হয়ে পড়েছিল, তা নিয়ে অনর্থক কথাবাজী করতে তার ইচ্ছে হোল না। আবার বললো—ঘুমোও নি কেন?

—আপনিও তো ঘুমোননি।

—আমার কাছে কি চাও।

—ভয় নেই ঘুমের ওষুধ ত চাইতে আসিনি, চুপি চুপি চরিত্তির চিবোতে আসিনি। পরিস্কার বলে গেল রীতা। একটুও বাধলো না তার।

অসীতের কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো।

ঝাঁঝাঁলো সুরে জিজ্ঞাসা করলো—তাহলে কেন এসেছেন?

—ওইটি বারণ করতে।

—কী?

ঐ রাগারাগি। আচ্ছা, মেয়েরা না হয় হিংসেয় জ্বলে মরে। কিন্তু আপনিও কেন আমাকে সইতে পারেন না বলুন তো?

অবাক হোল অসীত। এত রাতে এমনভাবে এসেছে এই নালিশ জানাতে?

ওকে কিছু বলার অবকাশ না নিয়েই আবার বলে চললো রীতা, পাউডারের বদলে আমাকে মুখে চুন মাখতে বলেছেন। কেন শুনি? চূনকাম—রঙকাম কোন্ মেয়েটা করে না আজকাল? কেউ কম, আমি না হয় বেশি করি। তেমনি ভেবে দেখতে পারেন না একটিবার, কি কাজ করে আমাকে টাকা রোজগার করতে হয়? থর থর করে কাঁপতে লাগলো রীতার গলা। বুঝি যা ফেটে পড়ে বিক্ষোভে। ভয় পেলো অসীত।

বললো—নিজের জায়গায় যাও তুমি এখন। এসব কথা পা
হলেও চলবে।

গলার থরথরানিটা সামলাতে সামলাতে রীতা বললো-
তাই যাচ্ছি। তবে—বোঝাপড়া আমাদের তোলা রইল। মে
রাখবেন, চুনের দরকারও হয়েছে আমার অনেকবার। তবে ?
নিজের জন্যে নয়, অনেক সাধুপুরুষের মুখে মাখাবার জন্যে। হ্যাঁ
চুন আর কালি। কালি আমার চোখের কাজলেই থাকে।

শুঁড়ি মেরে মেরে বিষাক্ত এক বিচিত্র রঙীন নাগিনীর মত
সরে গেল রীতা।

॥ আট ॥

ভোর হোল।

একটু বাতাসের আশায় হুড়োহুড়ি করে সবাই বার হয়ে এলো ডাকোটার খোলের ভিতর থেকে। যাক। যেন একপাল বন্য —দুর্ভিক্ষ-অনাথ। যেমন হয়েছে চোখ মুখেব ভাব, তেমনি বেশবাশের।

ধরাধরি করে বার করা হোল সুমতীদেবীকেও। গত সন্ধ্যায় গাছের ডাল কেটে জোড়া তালি দিয়ে বদখত আকৃতির একটা ষ্ট্রেচার বানানো হয়েছিল। ডাল কেটে সুমতীদেবীর পায়ে একটা বার্-ও বাধা হয়েছিল।

নিভন্ত ধুনির আগুনে পায়ে তাঁর আবার তাপ দেওয়া হোল। এবার আর বলতে হোল না লতিকাকে। নিজে থেকেই সে এগিয়ে গেল।

তারপরেই অসীত সবার কাছে পেশ করলো প্রস্তাবটা, মাঝ রাতের প্রস্তাব।

দেখা গেল, আপত্তি এলো না কারও কাছ থেকে। রণজিৎ সিং শুধু কি যেন বলতে যাচ্ছিল। বললো না। সবার মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের দলে টানবার মতন কাউকে না পেয়েই বোধহয় থেমে গেল।

ঠিক হোল, দুটো দল হবে পুরুষদের। ডালপালা কেটে কেটে জোগান দেবে রোভার, নন্দ গোস্বামী আর রণজিৎ সিং। অন্য দলে অসীত, সরোজলাল আর কেলিম্যান তা দিয়ে মাচা বানাবে। গদাধর দেশাই থাকবেন তার স্ত্রীর পরিচর্যায়।

বাকি মহিলা তিনজনও ওদের যথাসাধ্য সাহায্য করবে

দড়ির অভাবে মজবুত লতার যোগান দিয়ে, এটা-ওটা আগিয়ে দিয়ে।

প্রস্তাবটা গৃহীত হবার পরমূহুর্তেই কিন্তু দেখা গেল, উসখুস করতে করতে ভিন্ন দিকে পা বাড়িয়েছে রীতা।

—কোথায় যাচ্ছ? পথ আটকে দাঁড়ালো অসীত। পাশ কাটাবার চেষ্টা করে রীতা বললেন—আসছি।

—কোথা থেকে?

—গ্রীন্‌রুম থেকে।

—গ্রীন্‌রুম! এখানে! শুধু অসীত নয়। অবাক হোল সবাই।

তা দেখে অতিষ্ট ভাবে বলে উঠলো রীতা—ধেত্তোরি! চুরি করে ধরা পড়েছি যেন। ইয়া ইয়া মদ্দ পুরুষ একপাল, দাও এখন তাদের সামনে মেয়েদের সব কথায় ফিরিস্তি! যাচ্ছি ঝোপঝাপের আড়ালে, জামাকাপড় গুলো পালটে একটু ভদ্দর গোছের হয়ে আসতে।

ধমকে উঠলো অসীত—সে সব পরে হবে। আগে কাজ, তারপর অন্যকিছু।

পাশ থেকে বিভাদেবী ফোড়ন কাটলেন—আহা, কী যে বলো তোমরা! না খেয়ে থাকা যায় কিন্তু সাজন বিনে চলবে কেন গো? ছ্যা, ছ্যা, ঘেন্নায় মরি।

আর সহ্য করতে পারলো না রীতা। ফেটে পড়লো বিভা-দেবীর মুখের ওপর—বেশ করবো তোমার মতন হলে আমায় শ্যালে ছোঁবেনা?

পালটা উত্তর ভেসে এলো বিভাদেবীর—আমার আর কাজ নেই মা। শ্যালকুকুরে তোমাকে দিয়েই ভোজন সারুক। আমি ঠাকুরের নাম করতে করতে ড্যাব ডেবিয়ে দেখব।

আবার চাপান দিল রীতা—হ্যাঁ, দেখো তুমি, হাত গুটিয়ে বসে

বসে দেখবে না তো কে দেখবে? ঠাকুরের নাম হচ্ছে! ইহ কালের জ্যান্ত ঠাকুর এতগুলো মানুষ মরে কি বাঁচে তার ঠিক নেই, সেদিকে একটিবার চোখ আছে? চোখ বুজে পরকালের চিন্তা হচ্ছে! উদ্ধার হবে? কচু হবে!

শিটিয়ে সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল সবাই। ভাবছিল, যায় বুঝি এই জেনানা লড়াইয়ের ভেস্তে কাজটুকু ভেস্তে।

গেল না। তেড়ে ফুঁড়ে এবার সবার আগে পা বাড়ালো রীতাই।

ধমকে বললে সবাইকে—কী হোল? আমি না হয় যাচ্ছে তাই ফ্যাসন করি। কিন্তু কাজের লোকেরা সবাই এমনও হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে কেন? সেতু বন্ধের ইঞ্জিনীয়াররা মাচা বন্ধই শুরু করুন। দেখি একবার। কে কতবড় বিশ্বকর্মা?

কাজের বেলায় দেখা গেল, বিশ্বকর্মা কেউই নয়। তবু ঘণ্টা তিনেকের পরিশ্রমের ফলে আকৃতি বিহীন তিন তিনটে প্রশস্ত মাচা ওরাই বানিয়ে ফেলতে পারলো। খুশি হয়ে উঠলো সবাই ওরা নিজেদের কৃতিত্বে। এমন কি রীতা পর্যন্ত।

কলকলিয়ে অসীতকে বললো—এবার ছুটি তো ফিল্‌ড্‌ মার্শাল? যাই এবার?

হেসে ফেলে অসীত বললো, যাও। বেশী আড়ালে যেও না কিন্তু।

ছুটে যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে রীতা বললো—কম আড়ালে থাকলে আপনারই তো আবার বেহায়া বলে নিন্দে করবেন।

—দূরে গিয়ে মরবে নাকি বাঘ-ভাল্লুকের খপ্পরে পড়ে?

—সে তবু ভাল। ড্রেস চেন্‌জের সময়ে গ্রীনরুমের দরজা খুলে রাখলে কাছে থেকেও রেহাই পাবো না। নেকড়ে হায়না ছোঁকছোঁক করছে। ঐ—ঐ দেখুন। আঙুল দিয়ে রোভারকে

দেখিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে রীতা চলে গেল ফাঁকার বাইরে ঝোঁপের আড়ালে।

রোভার কিন্তু একটুও লজ্জা পেলো না।

যেন মস্ত একটা সুনাম শুনেছে এমনিভাবে মেটে গলায় হো—হো করে হেসে উঠে বললো—দ্য মোস্ট্ ট্যানট্যালাইজিং উইট্ আ'হ্যাভ্ এভার সীন। এ ডেন্জায়াস্ ডারলিং!·· ···

নয়

অত শীঘ্র যে অসীতের মুখের কথা সত্যি হবে, তা সে নিজেও কল্পনা কারনি। গেল রীতা সেন, হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে। এলোও মিনিট পাঁচেকের মধ্যে। তবে কাঁদতে কাঁদতে। আর এবারের সে নাচ তার বেতালা তাণ্ডব।

—মরে গেলুম। মরে গেলুম! জ্বলে গেল! উঃ মাগো—ও—ও—ও!

কাঁটা জানোয়ারের মতন আছড়ে পড়ে ছট্‌ফট্‌ করতে করতে গড়াগড়ি যেতে লাগলো অত বড় সুস্থ স্বাস্থ্যবতী মেয়েটা। বিছে কামড়েছে পায়ে! নীল হয়ে গেল বাঁ পায়ের পাতটা। রাঙা হয়ে চোখের তারা দু'টো যেন ঠেলে বার হয়ে আসতে চাইল। টান মেরে গায়ের জামা কাপড় আর মাথার চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো রীতা। চেনা যায় না। দেখলে ভয় হয়।

—মরে গেলুম গো, আমি মরে গেলুম! আমাকে বাঁ-চা-ও-!

কে বাঁচাবে? কি করে বাঁচাবে? কি আছে ওদের যা দিয়ে চিকিৎসা করবে? তাছাড়া এগিয়ে গেলও না কেউ। ভয়ে-পিছিয়ে রইল। কেউ বা বরাবরের মতন বিতৃষ্ণায়। গিয়েছিল রোভার। আহত পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে চেষ্টাও করেছিল।

—না, না! গেট আ-ও-ট!

রাক্ষুসীর মতন চিৎকার করে উঠেছিল আগে। পা টেনে নিয়েছিল। তারপরেই জার্মান যুবার মুখের উপর ঝাঁ করে এসে পড়েছিল নাচনেবালীব বেতালা একটা পা।

সেটা ইচ্ছাকৃত, না প্রক্ষেপের ফলে অনিচ্ছাকৃত পা-ছোঁড়া, তা বোঝা যায় নি।

—ও—হ্ গা-আ-ড্! নাকে হাত বোলাতে বোলাতে পালিয়ে এসেছিল রোভার।

তারপরেই এগিয়ে গেল অসীত। প্রথমটা সে কিছুই ভেবে পায়নি। তারপরেই কিন্তু তার সম্বিত ফিরে এলো। সহ্যও করতে পারলো না বোধ হয় অমন তাজা মেয়েটার ঐ রকম ছটফটানি।

নিরুপায়ের একমাত্র উপায় হিসেবে সে রীতার বৃশ্চিকাহত পা'টাতে পর পর কটা শক্ত করে দড়ির বাঁধন দিয়ে দিল।

বিষ হয়তো তাতে উপরে উঠলো না আর। নামলো তলায়।

পরিত্রাহি চিৎকার করতে করতে অসীতের একটা পা ছ'হাতে আঁকড়ে ধরে আকুলি বিকুলি হয়ে কাঁদতে লাগলো রীতা—আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি অসীত বাবু। আপনি যা বললেন, তাই শুনব! আমাকে বাঁচিয়ে দিন। আপনার পায়ে পড়ছি, বাঁচিয়ে, বাঁচিয়ে দিন আমাকে! ও মা গো-ও-ও-ও।

কাঠ হয়ে বসে রইল নিরুপায়ে অসীত। ঝিমঝিম করতে লাগলো তার মাথা।

জপের মালাটাকে কপালে ঠেকিয়ে একমনে চোখ মেললেন বিভাদেবী। ব্যাজার ভরা দৃষ্টিতে একবার তাকালেন রীতার দিকে। জপের সরঞ্জাম তুলে দিলেন নন্দ গোস্বামীর হাতে। তারপর মাটিতে একটা হাতের চাড় দিয়ে উঠে দপদপিয়ে হাজির হলেন রীতার কাছে।

—ঢ্যাঙ্গ ঢলানী! চিক্কুর মেরে মরছিস কেন? আমোলো যা! থাম্ থাম্ বলছি! নিষ্ঠুর নির্দয় কণ্ঠে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে দাবড়ে উঠলেন বিভাদেবী।

এমনিতেই অসহ্য যাতনায় পাগলের মতন ছট্‌ফট্ করছিল রীতা। তার ওপর চির বিদ্বেষী বিভাদেবীর সম্বোধন তার সইলো না। চীৎকার করে উঠলো—থামবো না! আরো তিনপর্দা চড়িয়ে দিল সে গলা।

—থামবিনে শতেক খোয়ারী? এমনও থাম্ বলছি! নইলে—

সমানে অগ্রাহ্য করে আরও চড়লো রীতার গলা—মরে গেলুম! ও মা—আ—আ—

—তবে রে হারামজাদী? ঠাস্ ঠাস্ করে হুটো বিরাট চড় বসিয়ে দিলেন বিভাদেবী রীতার গালে। চিৎকারটা মাঝ পথে হঠাৎ যেন হোঁচট খেয়ে আট্‌কে গেল রীতার গলার মধ্যে। শুধু তাই নয়। মুহূর্তে যেন তার সমস্ত আক্ষেপ বিক্ষেপ থেমে গেল। অথবা হয়তো হার মেনে এবার সে এলিয়ে পড়লো। বিস্ফোরিত হুটো চোখ দিয়ে তার শুধু গড়িয়ে পড়তে লাগলো অশ্রুধারা।

ঘাবড়ে গিয়ে বিভাদেবী এবার বসে পড়লেন তার পাশে।

মুখে তাঁর সমানে খৈ ফুটতে লাগলো—ঢং দেখলে বাঁচিনা! কামড়েছে বিছে, চেল্লাচ্ছেন আহ্লাদী আমার যেন সাপে কামড়াছে! আবার চোপা?" থামবো না? তোর বাপ থামবে রে হতচ্ছাড়ী! দেখি কম্‌নে কামড়েছে? দেখি না একটিবার শ্রীঠ্যাং খানি!

রীতার আহত পাখানা একহাতে মজবুত করে ধরে অসীতকে বললেন বিভাদেবী - ছুরি আছে? দাও দিকি একবার। এ্যাই গ্যাখো, অমন গলদাচিংড়ির মতন চোখ করে দেখছো কি বাছা? ভয় নেই। তোমাদের রূপসী কন্যেকে খুন করবো না। বার করো ছুরি।

নির্দেশমতন ছুরিটা তাঁর হাতে তুলে দিতে যাচ্ছিল অসীত। নিলেন না বিভাদেবী।

—আমাকে নয়। খোল ওটা। খোল। এইখানে একটু চিরে দাও তো। এই ছোবলানো শ্রীঅঙ্গটুকুতে, আহা, দাও না। অ্যাত্‌তো বড় লাশ, তুমি পুরুষ না? মেয়া-ছেলাও যে পারে গো। হাত কাঁপছে? দাও দাও বসিয়ে! হ্যাঁ আর একটু! বারকে রক্ত! এ যা কন্যে, সামলে উঠতে যা দেরী! ঠিক চুষে নেবে.

ওর দশগুণ তোমাদেরই কারো গতর থেকে। যাও হয়েছে, সরো এবার।

অসীত হাতটা সরাতেই তার বিস্মিত চোখের ওপর ঘটে গেল একটা আশ্চর্য ব্যাপার।

নিষ্ঠাবতী ধর্মশীলা বিধবা বিভাদেবী ঝুঁকে পড়লেন তাঁর অত ঘৃণা-বিদ্বেষের পাত্রী রীতার পায়ের ওপর। তারপর মুখ দিয়ে আহত স্থান থেকে টেনে টেনে রক্ত বার করে ফেলতে লাগলেন।

আধঘন্টা ধরে চললো তাঁর সেই বিচিত্র চিকিৎসা। হাঁফাতে লাগলেন তিনি।

ওদিকে ক্রমে ক্রমে একেবারে কমে এলো রীতার ছটফটানি।

বিভাদেবীরও রক্ত মোক্ষণ শেষ হোল। পরম আরামে পাশ ফিরলো রীতা।

—আঃ হ্। কথাটা আপনা থেকে বার হয়ে এলো তার মুখ দিয়ে।

দু'পা হেঁটে ক'টা জংলীপাতা এনে হাতে চট্‌কে রীতার আহত পায়ে বেঁধে দিলেন বিভাদেবী। আবার তুবড়ি ফুট্‌তে লাগলো বিভাদেবীর কণ্ঠে।

ঝাঁটার বাড়ি দিতে হয় ওই রং জ্যাব্‌ড়ানো কালামুখে সপাসপ্ সপাসপ্! কী সর্বনেশে ছেনালী মা! কি শত্তুর, কি শত্তুর! জাত বেজাত নেই, ঠিক ঠিকানা নেই হারামজাদীর পায়ে মুখ দেওয়ালে আমার, জাত ধর্মো সব রসাতলে পাঠালে, তবে ছাড়লে! আমার মেয়ে যদি হোত সেবা করতুম? দেখছিস অমন রূপের ধাচন, বাঁ পায়ের লাথি মারতুম গুনে গুনে! ওই ছোবলানো ঠ্যাঙেও মারতুম, মুখেও মারতুম। ছোরটে ফুঁদিতুম সর্বাঙ্গে। কালমুখী ডাইনি!

অবাকের উপর অবাক কাণ্ড। রীতার মুখ দিয়ে একটাও কথা বেরোলো না আর। মুখবুজে পড়ে সে শুনতে লাগলো।

ধমকে উঠলেন বিভাদেবী আবার অসীতের ওপর—বলি হ্যাগা—গোপালের মতন কি দেখছো বাছা? অষুধ বিষুধ এবার একটু দাও না।

—ওষুধ! কি ওষুধ দেবো?

—আর কিছু না থাক, ওই-ওই যে তোমাদের ওই ক্যানেস্তারা ভর্তি ইয়ের চোনা আছে, তাই একটু দাও না গিলিয়ে! গায়ে হাতে একটু বল পেয়ে চাঙা হোক্ মেয়েটা।

আদেশ পালনে দেরী হলো না অসীতের। নিজের হাতে করে রীতাকে পান করিয়ে দিল খানিকটা "ইয়ের চোনা," অর্থাৎ বীয়ার।

গজ্‌গজ্ করে রীতাকে সাতশো শাপ-শাপান্ত করতে করতে বিভাদেবী উঠে চলে যাবার উপক্রম করতেই বাধা দিয়ে বিভাদেবীর পাদুটো চেপে ধরলো রীতা।—না! অনুনয়ে ডুকরে উঠলো মেয়ে—আর একটু বোস!

বাধা পেয়ে ম্যাস্ ম্যাস্ করে উঠলেন বিভাদেবী—আহা গো, তা আর নয়? পূজো পাট সব চুলোয় দিয়ে আমি এখন বসে থাকি আমার সাতকুলের আদুরী কুটুম, ওঁকে নিয়ে। ছাড়, বলছি পা! ছাড়লি?

ছাড়লো না রীতা।

—মারব কিন্তু লাথি। মর খোঁড়া হয়ে! মারি লাথি?

· মারো না, মারো! তবু ছাড়লো না!

ছাড়লো না রীতা। ছাড়াতে পারলেন না বিভাদেবী। মারতেও পারলেন না লাথি। বসে পড়লেন আবার তিনি। জাত-ধর্ম গ্রাহ্য না করেই তিনি পরম স্নেহে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন তাঁর চক্ষুশূল সেই নাচুনী কন্যার।

পরম আরামে আর নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল রীতা।

ধরাধরি করে ওরা মাটি থেকে তুলে রীতার ঘুমন্ত দেহটাকে শুইয়ে দিল একটা মাচার ওপরে।

বেলা বাড়লো।

সূর্য উঠলো মাথার ওপর। আবার শুরু হোল প্রাণদেবতার সোনালী আশীর্বাদ, সেই সুতীব্র জ্বালাময় অগ্নিকাণ্ড। ছুটোছুটি করতে লাগলো সবাই অসহ্য গায়ের জ্বালায়। মাটি থেকে মুঠো করে ঘাস উপড়ে ফেলে সবাই সেই অনাবৃত স্যাঁত স্যাঁতে জমির ওপর বিছিয়ে দিতে লাগলো নিজেদের দেহগুলোকে—একটু খানি শীতল শান্তির আকুল আশায়।

পুরুষরা সবাই খুলে ফেললো উপরের পোষাক।

মেয়েরাও আলগা করলো আঁচল, খুলে দিল ব্লাউজের বোতাম, আলগা করলো অন্তর্বাসের গ্রন্থি। পরিস্থিতির প্রভাব ওদের সবাইকে বাধ্য করলো চিরাচরিত সভ্যতা—শালীনতার বাধা আলগা করতে।

ব্যতিক্রম দেখা গেল শুধু বিভাদেবীর।

রীতাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে সেই যে বেরিয়েছিলেন তিনি, আবার চোখ বুজে আর জপের মালা হাতে নিয়ে, যেন পাথর, একটুও চাঞ্চল্য ফুটলো না। জপ থামলো না।

খাদ্য সামগ্রী যা হাতে ছিল, তা থেকেই অসীত যতদূর সম্ভব হাত টেনে সবাইকে—একটু—আধটু ভাগ করে দিল। তার সংগে একঢোক করে সেই বীয়ার কিংবা কালো কফি।

গরমের প্রকোপে খিদে সত্বেও খাওয়ার রুচি সবারই চলে গিয়েছিল। চাইছে পানীয় অথচ সেইটাই নিদারুণ সমস্যা।

তবু যে যা পেল,' মনের ভাব গোপন করে হাত পেতে সবাই তা নিল। মুখেও দিল।

লতিকা একবার বললো—মনে পড়ছে "গোল্‌ড্‌—রাশ"—এর কথা।

অসীত বললো—গোলড্ কই ?

লতিকা বারেক আড়চোখে তাকালো ঘুমন্ত রীতার দিকে।

তারপর কণ্ঠস্বরটাকে একেবারে নির্দোষ করে বললে—দে আর এ গোলডেপ মেড্। ভাঙাতে পারলে ঐ সলিড্ স্বর্ণ কুমারী হয়তো তেমন ভাগ্যবানদের স্বর্ণ সিংহাসনে বসাতে পারেন।

বক্রোক্তির খোঁচাটুকু হয়তো সহ্য করে নীরবেই দিয়ে আসত অসীত। পারলে না শুধু লতিকার কথা শুনে রনজিৎ সিং—এর অভদ্র হাসির জন্যে।

বলে ফেললো—বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা পড়লে মুক্তোর যে তাতে বেইজ্জৎ হয়, সেটা কিন্তু মুক্তোর বোঝা উচিত।

কালো হয়ে গেল লতিকা আর রনজিৎ দুজনেরই মুখ। চলে গেল অসীত ওদের কাছ থেকে।

সরোজলাল বললো—এভাবে প্রসাদ—বিতরণ করে কদিন সামলাবেন ?

মনটা খিচড়েই ছিল অসীতের। তাই একটু চড়াসুরেই তার মুখ দিয়ে বার হয়ে গেল—কী দয়া আমার !

বিভাদেবীকে কিন্তু আগের দিনের মতই কিছুতেই রাজি করা গল না আহার্যের ভাগাভাগিতে। অসীতের সব অনুনয় ব্যর্থ হাল। প্রাণ যায়, তাও ভাল, জাতধর্ম খোয়াতে পারবেন না তনি।

ওকে আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে নন্দ গোস্বামী চুপি চুপি বললে —কেন বারবার ঝুট—ঝামেলা করে কষ্ট পাচ্ছেন ? কালও ানানি উনি। এখনও খাবেন না।

—বাঁচবেন কি করে তাহলে ?

মৃদু হেসে নন্দ জবাব দিল—আমার আপনার চেয়ে বহাল

তারিতে বাঁচবেন। আপনি জানেন না, বামুনের ঘরের বিধবারা অত চট করে মরেন না। উপোস-টুপোস ওঁর গায়-সহ্য হয়ে গেছে সেই উনিশ বছর বয়েস থেকে।

হাল ছেড়ে দিয়ে অসীত এসে বসলো ঘুমন্ত রীতার শিয়রে——পাহারা দিতে। অবাঞ্ছিত দারিত্বভারের বিরক্তিকর ঝামেলা-ম্বত।

দশ

রাতা চোখ মেললো আরও অনেক পরে। সূর্য তখন পশ্চিমে ঢুলুঢুলু।

পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে সে তাকালো অসীতের দিকে। ম্লান হাসলো একবার। বললো—এটা সূর্য ওঠার সময় হলে বলতে পারতুম "দিন যাবে আজি ভাল"।

ধমকে উঠলো অসীত—ফ্‌করামি রাখো!

শুয়ে শুয়েই আস্তে অসীতের একটা হাত চেপে ধরে রীতা বললো উঠবেন না। প্লীজ! আর একটু বসুন।

কি ছিল সেই আকুতিতে অগ্রাহ্য করতে পারলো না অসীত।

বললো—খিদে পায়নি?

রীতা জবাব দিল—পেটের কথা পেট বলবে। মন ভরে গেছে আজ।

—খাবে?

—উঠতে পারবো না কিন্তু। হাঁ করছি, মুখে দিন। আচ্ছা রুগী তো আমি? দেয় না লোকে রুগীকে খাইয়ে? আমরা দিইনা?

তর্ক করলো না অসীত। দিল খাইয়ে। ছোট্ট ছোট্ট হাঁ করে চড়ুই পাখীর মতন টুকটুক করে খেলো রীতা। বীয়ারের পাত্রটা অসীত তার মুখে ধরতেই কিন্তু রীতা ধড়ফড় করে বলে উঠলো—না, অতটা পারবো না। আপনার হাত থেকে মদ খাবো, অতটা বেহায়া—এখনো হইনি। দিন্। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে নিজেই সে পান করলে বীয়ারটুকু।

কটা মুহূর্ত নীরবে কাটলো।

এভাবে এখন কথা যে কোনদিন শুনতে পাবে, তা ভাবতেও পারেনি অসীত। গল্প মুগ্ধের মতন বলে ফেললো ঃ

—আর দেব ?

—উধাও। যা সত্যি নয়, তা টেকে কখনো ? তাহলে আজ আর ঘরদোর সব ছেড়ে বনে-পাহাড়ে নাচ দেখিয়ে বেড়াই পেটের জন্যে ?

বড্ড ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছিল প্রসংগটা। তাই সাবধান হবার চেষ্টায় অসীত আর কিছু বললো না।

রীতা কিন্তু আপন মনেই বলে চললো—একটা পেট হলে কি ভাবতুম ? অনেকগুলো যে ! বিধবা মা, অনেকগুলো ছোট ভাই বোন। হা করে তারা চেয়ে থাকে আমার মনি-অর্ডারের আশায়। জানেন, আমার নয়-ভাইবোনের কাছে আমি যেন মেয়ে নই, দিদি নই, জ্যান্ত ঠ্যাং একটা। এই যদি এখানে মরে নাই। ওরাও মরে যাবে না খেতে পেয়ে। তাই—এমন হয়েছে এখন -ওদের —ওদের জন্যে টাকা পাঠানো ছাড়া আজ কোন কথা, এমন কি নিজের কথা একটিবারও আমি ভাবতেই পারি না।

রীতার কণ্ঠ আর কথার বিষাদটুকু অসীতকে বিষন্ন করে তুলেছিল ধীরে ধীরে।

তাই এবার সে আসতে আসতে বললো ঃ থাক্। বলতে কষ্ট হচ্ছে।

রীতা বললো—বলি না তো, কাউকে বলিনি কোনদিন। আপনাকেই শুধু আজ বলছি। কেন বলছি, তাও জানি না। না বলে থাকতেও পারছি না। যদি বলি। আমি চাইনি এমন হতে, বিশ্বাস করবেন কি ? সত্যি বলছি। চাইনি, আজ আমাকে যা দেখছেন তা আমার মা'র সৃষ্টি। আর সৃষ্টি আপনাদের আজকের এই সমাজের, যে-সমাজ বাঙালী মেয়েকে তুলসীমঞ্চ, লক্ষ্মীর ঝাঁপি ছেড়ে ফ্লাড-লাইটের তলায় হাজার হাজার নেকড়ের সামনে আ‌ত্ম-

উলংঙ্গ হয়ে রঙ মেখে নাচের মাঝে মন-ভোলাতে বাধ্য করে। কেন? না, একমুঠো খিদের ভাত আর লজ্জা এ্যাড়ার একখানা কাপড়ের জন্যে। পেট বড় দুষমন, ফিল্ড-মার্শাল!

—জানি।

—কিছুই জানেন না। কতটুকু জানেন? আমি বলি হচ্ছি একটা খিদের তাড়া মেটাতে আর আপনারা, মানে পুরুষেরা? কত খিদের খোরাক মেটাতে চায় তারা আমাকে দিয়ে তা জানেন? বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠে বসলো রীতা।

আরও চোখদুটো তার জ্বলে উঠলো। বিক্ষুব্ধ ভিসুভিয়াসের মতন সে লাভা উদগীরণ করে বললো: আমায় সাজগোজ দেখে আপনারা ঘেন্না করেন, মেয়েরা অব্দি সইতে পারে না আমাকে। অনেকে তো স্পষ্টই বলে—"বয়-হান্টার্"। কিন্তু আমি যদি সেই লোলামতাজের মতন জিজ্ঞাস করি-"হুইচ্ গার্ল অন্ আর্থ ইজ নট্ এ বয়-হান্টার্?" কি জবাব দেবে কে শুনি?

—রীতা!

থামলো না রীতা। ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে বলতে লাগলো-বয়হান্টার! একা আমিই শুধু বয়-হান্টার, না? বেশ, তাই। আর বাড়ন্ত গড় বলে অসহায় পেয়ে আমায় সেই বারো বছর বয়সে কচি শরীরের ওপর বাবার বন্ধু যে গার্ল-হান্টারটি একদিন নখের আঁচড় বসিয়ে দিয়েছিল, সে কথা আমি কাকে বলবো? কাকে দেখাবো সেই দাগ? আজও আছে সেটা? দেখবেন?

শিওরে উঠে আস্তে বললো অসীত—না, না! না কেন? দেখুন একবার আপনাদের কীর্তিটা। দেখে বুঝুন। মানুষ আমার সংগে কি ব্যবহার করেছে। আর কী চায় আমার কাছে? আরো বেশী করেই চায়। বারো বছরের সেই মেয়েটা আজ বাইশ পেরিয়েছে। সেই কাঁচা শরীরে ভরা জোয়ার এসেছে। তাই ওদের খিদে আর টানা হেঁচড়া আরো বেড়েছে।

আমিও তাই দিব্যি করেছি। আমিও ওদের মায়াতে ভুলিয়ে সর্বনাশ করবো! মেয়ে-পুরুষ কাউকে বাদ দেবো না। তাই যতদিন আমি বাঁচবো। যতক্ষণ আমার জ্ঞান থাকবে। আমি এমনি করেই সাজবো। রঙ মাখবো, বেশ করে! এমন হয়েছে কী? এরপর —এরপর—আর বলা হোল না রীতার। বাধা পড়লো মাথার ওপরে একটা শব্দ শুনে। চমকে উঠে ওরা দুজনেই মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালো। এক লাফে ওরা নেমে পড়লো মাচার উপর থেকে।

শুধু ওরাই দুজনে নয়। সে-শব্দ শুনেছে দলের সবাই। বেধে গেছে ছুটোছুটি। আকাশ পানে মুখ তুলে প্রানপণে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে অনেকে। কেউবা জামা কাপড় নাড়ছে পতাকার মতন। নন্দগোস্বামী লেগে গেছে নিতন্ত একটা ধুমির আগুন খুঁচিয়ে ধোঁয় বার করতে।

একটা এরোপ্লেন যাচ্ছে। অনেক উঁচু দিয়ে। ওদের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূর নিয়ে।

মুক্তির আশায় পাগল হয়ে উঠেছে তাই ওরা সবাই। প্রবল উৎসাহে সবাই মিলে চেষ্টা করছে। প্লেনটায় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে।

বৃথা চেষ্টা। বৃথা পরিশ্রম।

এরোপ্লেনটা একইভাবে তার গতিপথে ওদের পাশ কাটিয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

বুকভরা আশার পর পুঞ্জ পুঞ্জ হতাকবার ওরা এবার ভেঙে পড়ল। লুটিয়ে পড়লো মাটির ওপর, যেন মানুষ নয়। ক'ট বেলুন। গ্যাস বেরিয়ে চুপসে নেতিয়ে পড়েছে। সহ্য করতে পারলো না অসীত সেই দৃশ্য। টলতে টলতে গিয়ে সেও ধপ করে বসে পড়লো এক কোণে একটা বিরাট গাছের তলায়, সামনে এতক্ষণ একা বসে ছিল সরোজলাল। আশ্চর্য! লক্ষ্য করলে অসীত অতগুলো মানুষের মধ্যে একা সরোজলাল রয়েছে অচঞ্চল।

একটা সিগ্রেট ধরিয়ে রিঙ পাকাতে লাগলো অসীত।

আশা নেই। এমন করে যখন উদ্ধারের উপায় মাথার ওপরে হাতছানি দিয়েও পালিয়ে গেল, এখন আর কোনও আশাই নেই।

এখন শেষ উপায়......

অসীতের মনের কথাটারই যেন প্রতিধ্বনি তুলে এমন সময়ে সরোজলাল বলে উঠলো—বলেছিলাম। ও আশা করবেন না। তাহলে তো এমন মনমরা হতে হোত না।

মনে পড়লো অসীতের, বলেছিল বটে সরোজলাল।

প্রস্তাবটা এবার সরাসরি পেশ করেই বসলো অসীত। বললো-তুমি পারবে?

—কী?

—একা এই জংগল পার হতে?

চমকে মুখ তুলে অসীতের দিকে সোজাসুজি তাকালো সরোজ লাল। অবাক হয়ে গেল। —আমি?

—হাঁ, তুমি এখানকার পথ-ঘাটের হদিশ একমাত্র তোমারই যা জানা। শরীরও মজবুত। বনে-পাহাড়ে জোর কদমে পা চালাবার হিম্মৎ তোমারই আছে। পারলে তুমিই পারবে।

—কিন্তু—

—কিন্তুর কথা পড়ে হবে। কদিনে পারবে তুমি? তিন? চার?

—তিনদিনে পারতে পারি। যদি অবশ্য পথ ভুল না করে বেঁচে থাকি। কিন্তু—

তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর—

বাধা দিয়ে অসীত বললো—বিশ্বাস আমি তোমাকে করি সরোজ লাল। ভুল হয়তে আমার হতে পারে। তবু তোমাকে খুনীর মতন অবিশ্বাস করতে সত্যিই আমার বাধে।

—ধন্যবাদ।

—তাহলে ?

—তাহলে ও আর একবার ভেবে দেখতে বলবো।

উঠে পড়ে সরোজ লাল পা বাড়ালো সেই দিকটায়। যেখানে দেখা যাচ্ছিল লতিকা আর রনজিৎ সিংকে।

এগারো

সন্ধ্যার সময় নতুন ব্যবস্থা মত মেয়েরা গিয়ে ঢুকলো খোলের মধ্যে।

তার আগেই যথারীতি সুমতীদেবীর ভাঙা পায়ের পরিচর্যা সেরে একা একা পায়চারি করছিল লতিকা।

অসীত তার কাছে গিয়ে বললো—আপনারও আর বাইরে থাকা উচিত নয় লতিকাদেবী।

কথাটা গ্রাহ্য না করে সমানে হাঁটতে হাটতে লতিকা বললো- আমার কি আপনি অভিভাবক—উচিত অনুচিত বোঝার মতন বয়স হয়েছে মিঃ বসু।

অসীত বললো—জানি। আমি অন্ধ নই।

—মানে? এবার ফিরে দাঁড়ালো লতিকা ওর মুখোমুখি বললো—কানাও নন?

—না।

—আমার কিন্তু আজই হঠাৎ মনে হচ্ছিল। আপনার একটা চোখ নেই।

—একচোখা না হলে, অন্ততঃ আপনার ঐ পা-ভাঙা মায়েরও একটা খবর না নিয়ে সারাটা দিন শুধু আর একজনের নজরদারী করলেন কী করে, বুঝতে পারছি না।

আর দাঁড়ালো না লতিকা। উত্তরের জন্যে অপেক্ষামাত্র না করে সে ঢুকে পড়লো প্লেনের খোলা-জেনানা শিবিরে।

দ্বিতীয় রাতটা হয়ে উঠলো আরও সাংঘাতিক। দলের প্রায় সববার মনে গেঁথে বসেছে হতাশা, ফলে দেখা দিয়েছে আসল আতংক। মনের জোরও প্রায় সবারই ধ্বসে পড়েছে। রুচি না থাকলেও খিদে আর তেষ্টা সবারই রাক্ষুসে হয়ে উঠতে চাইছে।

বিনা চিকিৎসার সুমতী দেবীর জ্বর দেখা দিয়েছে এক গা। অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে পড়ে কাৎরাচ্ছেন আর বকছেন।

সবচেয়ে অবাক কাণ্ড ঘটলো বিভাদেবীর আর রীতার আচরণে দেখা গেল, রীতা শুয়েছে বিভাদেবীর কোল ঘেঁসে, আর জাতধর্মের আশঙ্কা কী ভুলে মা হয়ে রীতার গায়ে মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে তাকে ঘুম পড়াচ্ছেন বিভা দেবী।

তবু একসময়ে ভোর হোল সেই রাতও।

উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো ওরা আবার একমুঠো খাবার আর একঢোক পানীয়ের জন্যে। যেন কতকাল কছু মুখে পড়েনি ওদের। চেহারা হয়েছে ছন্নছাড়ায় মতন। চেনা যায় না।

আহার্য-পানীয় সবাইকে অসীতই আবার ভাগ করে দিল। মুখে তা টের পেল না কেউ। কেউ বা জুলজুল করে অসহায়ের মতন তাকিয়ে রইল। কারো চোখে ঝিলিক দিল অতৃপ্তির শিখা।

ছড়িয়ে পড়লো সবাই।

বিভাদেবীকে আজও কিছু খাওয়ানো গেল না। এল না তাঁর জপেও বিরতি। তবে আজ অন্যদিনের মতন তাকে সোজা হয়ে বসে থাকতে দেখা গেল না। সারাক্ষণ ঠেশ দিয়ে রইলেন একটা গাছের গুঁড়িতে। মাঝে মাঝে এলো ঢুলুনি। জপ বন্ধ হয়ে গিয়ে হাত থেকে জপের মালা খসে গেল কবার।

শংকিত হোল অসীত। বাঁধে ফাটল ধরেছে।

আজ যেন কারো আর কিছু করবার উৎসাহসেই। কথা বা আলোচনার পর্যন্ত সামর্থ নেই। নির্জীব নিঝুম।

রীতার প্রসাধন কিন্তু বাদ গেল না। ঝোঁপের আড়ালে নয়, সেটা সে আজ প্লেনের খোলের মধ্যেই সেরে বার হয়ে এলো। তারপর গিয়ে বসল আপন থেকেই রোভারের কাছে।

চুপি চুপি অসীত একটা বড় প্যাকেট বেঁধে ফেললো। ইশারা করে সরোজ লালকে কাছে ডাকলো। তোর হাতে তুলে নিল সেই

প্যাকেটটা আর একটা বীয়ারের টিন। ওদের ভাগে এবার যা পড়ে রইল তা অতি নগন্য। তবু সবাইকে বঞ্চিত করে সরোজলালকে রসদের জোগান দিতেই হোল। সবার দায়িত্ব মাথায় নিয়ে তাকেই যে পাড়ি দিতে হবে অনির্দেশ যাত্রায়।

তারপর ওদের কাছে নিয়ে দাঁড়ালো অসীত। এবার তাকে বলতে হল সেই কথা, যে সে বলতে পারেনি দুদিনের মধ্যে। শংকটজনক পরিস্থিতি। অসীতের অজানা ছিল না যে মজুত রসদ থেকে অমন একটা সিংহ-ভাগ মাত্র একজনের হাতে তুলে দিয়ে সে যাকে ফেরার করে দিচ্ছে শুনলে তা কেউ বরদাস্ত করতে চাইবে না। হয়তো মার মুখো হয়ে ক্ষেপে উঠতেও পারে। তবু ও-ছাড়া তার আর উপায়ই বা কী?

কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ওরা যেন আভাস পেয়ে মুখ তুলে তাকালো।

অসীত বললো—একটা কথা আপনাদের সবাইকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। এভাবে আধমরার মতন হাত পা গুটিয়ে বসে বসে হায় হুতাশ করলে আমাদের ছিটে ফোঁটাও উদ্ধারের আশা নেই। অথচ সবাই মিলে আমরা যে পায়ে হেঁটে পাড়ি দেবো এই বিজন বন পাহাড় সেটাও সম্ভব নয়। তাই সাহায্যের খোঁজে আমি একা সরোজলাল বাবুকেই পাঠাচ্ছি। পারলে, উনিই পারবেন।

ওদের কাউকে আর কিছু বলার ফুরসৎ না দিয়েই অসীত সংগে সংগে মুখে উৎসাহ ব্যঞ্জক হাসি ফুটিয়ে তুলে সরোজলালকে বললো—তৈরী?

সরোজলালকে জবাব দিল, হাঁ।

—বেরিয়ে পড়ো তাহলে। গুড্ নাইট।

—ধন্যবাদ।

অসীতের মনে হোল, ক্ষণেকের জন্যে যেন অতবড় মানুষটা নুয়ে

দাঁড়িয়ে পড়লে অসীতের সহৃদয় আচরণে। একটু হাসলেও। কান্নাম্লান ফ্যাকাসে সেই হাসি।

তারপর ধরা-ধরা গলায় আবার বলে উঠলেন—আমাকে এভাবে বিশ্বাস করার জন্য অনেক, অনেক ধন্যবাদ।

পরক্ষণেই অসীতের হাতদুটো আকাঁড় ধেরে কটা সাজার পাতা ছিরে সে উলটো দিকে হাঁটতে সুরু করে দিল। একটি বারও পিছু না ফিরে সটান এগিয়ে গেল কিন্তু······

ফাঁকটুকু পার হয়ে যেই সরোজলাল জংগলের মধ্যে ঢুকেছে যায়, অমনি ঘটে গেল একটা অভাবনীয় কাণ্ড।

সহসা লতিকা ককিয়ে একটা চিৎকার তুলেই উন্মাদের মতন ছুটে গেল সেদিকে। আওয়াজটি কানে যেতেই থমকে ফিরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সরোজলাল। লতিকা গিয়ে আছড়ে পড়লো তার বুকের উপর। সরোজলালও যেন পরম স্নেহ ভয়ে তাকে বুকে চেপে ধরল। ধরে কতকী বলে চললো। দূর থেকে তার কিছুই শুনতে পাওয়া গেল না। শুধু অবাক হয়ে গেল সবাই।

অবাক হয়ে গেল অসীতও তার মনের মধ্যে ছুটো ছুটি সুরু হয়ে গেল অনেকগুলো চিন্তার। মানে কি লতিকার এহেন বিচিত্র আচরণের।

একটা মানুষ সব্বার জন্য অনির্দেশ যাত্রায় হয়তো মারবার মুখেই এগিয়ে চলেছে, তাই কি তার এই নারীসুলভ মমতার উচ্ছাস? নয়! ও ··মেয়ে অন্ততঃ তেমন ধাতুতে তৈরী নয়।

তাছাড়া সরোজলালরই যা এই ব্যবহারের মানে কি? যেমন ভাবে মেয়েটাকে আঁকড়ে ধরে কি সব বলে চলেছে, তাতে তো সন্দেহ জগারই কথা যে কোনও মানুষের।

একটা দমকা ঝড়ে যেন অসীতের চোখের সামনে থেকে কুয়াশার পর্দাটা নিঃশেষে সরে গেল। বিস্ময়ের ছিটে ফোঁটাও রইল না আর ওর মনে। মিলে গেল ধাঁধার উত্তর! পরিস্কার

হয়ে গেল সুন্দরী লতিকার সব ইতিবৃত্ত। টের পেল অসীত, কেন তার অত চেনা মনে হচ্ছিল লতিকাকে ?

ওদিকে লতিকার বাহুপাস ছাড়িয়ে সরোজলাল ততক্ষণে আবার ধরেছে বনপথ। শেষ সীমানায় পৌঁছে বারেক সে আবার পিছু দিকে তাকালো। হাত নেড়ে লতিকাকে যেন জানালো বিদায় সম্ভাষণ তারপর উধাও হয়ে গেল আঁধারঘন বিস্তারের মধ্যে।

ধীরে ধীরে লতিকা আবার দিয়ে এলো। বিরক্ত হয়ে গেছে তার রক্তাধর মুখখানা। নিভে গেছে সুন্দরী। পাশ ফিরে যাবার সময়ে অসীতের দিকে বারেক রহস্যময় তির্যকদৃষ্টিতে তাকিয়ে সে ভিড়ে গেল আর সবার মাঝে।

সরোজলালের যাত্রাপর্বটা সবাই এতক্ষণ মুখ বুজে লক্ষ্য করছিল। এবার সুরু হয়ে গেল ওদের মধ্যে সাতরাজ্যের কথা বলাবলি। দেখা গেল, এই প্রথম জপের মালা নামিয়ে রেখে বিভাদেবীও যেমন ওদিকে হাত-পা নেড়ে নন্দ গোস্বামীর সংগে কি সব উত্তেজিত আলোচনা সুরু করে দিয়েছেন, তেমনি গদাধর তার অসুস্থা স্ত্রীকে একা ফেলে রেখে আলোচনায় মেতে গেছেন জার্মান তু'জানার সংগে।

সেই আলোচনায় রীতার উৎসাহও কম মনে হোল না। রোভারের একটা হাত তাকে নিবিড়ভাবে আঁকড়ে রয়েছে তার কটি বেড় দিয়ে!

দল ছেড়ে লতিকাকে সংগে নিয়ে রণজিৎ সরে গেল খানিক দূরে। চাপা গলায় সেও অনর্গল কত কী বলে চললো লতিকাকে। লতিকার মুখে কিন্তু কথার বদলে দেখা গেল বড় বড় অশ্রুজলের ফোঁটা। কথা বলতে বলতে রণজিৎ কখনও হাত মুঠো করে বাতাসে ছুঁড়ছে, কখনও বা তার মুখখানা হয়ে উঠেছে ভয়ংকর!

অসীতের মনেব মধ্যে খোঁচাতে লাগলো আবার সেই পুরোনো অশংকাটা।

বাধালো বুঝি ঝামেলা। যে কোনও মুহূর্তেইত রণজিৎ সিং…

ভাবনার অন্ত রইল না অসীতের। একটা মাথায় অনেক চিন্তা।

তিন দিনের আগে এতটা দুর্গম পথ পাড়ি দেওয়া সরোজলালের পক্ষেও সম্ভবনা। তারপর যদি আসে সন্ধানী উদ্ধারকারীরা এবং নিতান্তই যদি জোর বরাত হয়, তাহলেও যাবে আর একটা দিন। তার মানে অন্তত: চারটে দিনের ধাক্কা এমনও।

যদি আসে। সবটাই থর থর করছে এই ছোট্ট 'যদি,টার ওপর।

সরোজলাল বলেছিল, গৌহাটিতে ছোটখাটো একটা হেলিকপ্‌টার সে ক'বার দেখেছে। জানে না, সেটা ওখানকারই সম্পত্তি কিনা?

প্রকাশ্যভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী কোনদিইই নয় অসীত। তবু এমন তার প্রবল ইচ্ছা জাগল একবার যেন মাথাকুটে বলতে পারে—হে ঠাকুর, সরোজলালের ধারণা যেন সত্যি হয়!

সরোজলালের যাত্রারম্ভের সংগে সংগে মানুষগুলোর আলোর প্রদীপ যে একটুখানি উথল হয়ে উঠেছিল, সেটা নজর এড়ায়নি অসীতের। ঘণ্টাদুই যেতে না যেতে সুরু হয়ে গেল পালটা প্রতিক্রিয়া! নিভে আসতে লাগলো সেই প্রদীপ শিখা। এবার ওরা যেন আরও মুষড়ে পড়তে লাগলো।

চারদিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিল—অসীত।

কেলিম্যান আর গদাধর তখনও আলোচনা চালাচ্ছে। এবার অবিশ্যি ফিস্‌ফিস্ করে। রীতা অ্যাবধশোয়া নতন পোজে এলিয়ে পড়েছে ঘাসের গালচেত। পাশে বসে বিসদৃশ ভাবে তার ওপর ঝুঁকে পড়ে কি বোলাচ্ছে রোভার।

রনজিৎ একা বসে আছে ভ্রূকুটি আঁকা মুখে। লতিকা উঠে গেছে সুমতীর কাছে।

বিভাদেবী চোখ বুজেছেন গাছের গুড়িতে ঠেঁস দিয়ে। হাতে সেই জপের মালা। নন্দ হা করে দার্শনিকের মতন চেয়ে আছে আকাশের দিকে।

সুমতীর জন্যে দুর্ভাবনাটা ক্রমশঃ যেন সিন্দবাদের দত্যির মত ঘাড়ে চেপে বসতে চাইছে অসীতের। ভাঙা পা, জ্বর, ডিলিরিয়ম। তার ওপর দুর্বলতা বাড়ছে। জুঝবে কীসের জোরে দিন কাবার হয়ে এলো। পেটে পড়েছে সবারই সেই একভাগ আর একঢোক। হাতের খাদ্য নিঃশেষ প্রায়।

সবাই জেনে ফেলেছে যে তাদের সঞ্চয় থেকে মোটা ভাগটা নিয়ে গেছে সরোজলাল। কী হয়—কী হয় অবস্থা।

সন্ধ্যা ঘনালো। গা-তোলার সময় হোল সবার। অথচ উঠার নাম নেই কারো। সামর্থ নেই। ইচ্ছেও নেই যেন। তবু উঠতে হোল। তাড়া লাগাতে হোল অসীতকেই।

সুমতীকে ডাকোটার খোলে তোলার সময়ে সাহায্য করলো নন্দ গোস্বামী।

তারপর হাত ঝেড়ে অসীতকে বললো—সব লাল হো যায় গা?

—মানে?

—এরপর কে কাকে তুলবে?

নির্বিকার নন্দ কিন্তু বলে গেল—বললেই হোল, ভগবান মানি না? কে তবে এমন করে দেখিয়ে দিচ্ছে যে তাঁর কাছে সবাই সমান? কে তবে এমন করে মানুষের গড়া জাত বেজাত আর উঁচু নীচুর মনুমেন্ট ভেঙে গুঁড়িয়ে এতগুলো মানুষকে এখানে একাকার করে ছাড়লে? সব এক হয়ে যায়গা, সব লেবেল হয়ে যায় গা!

হাসতে হাসতে চলে গেল নন্দ গোস্বামী তার মাচার দিকে।

চোখ ফেরাতেই দেখতে পেল অসীত, রোভার উঠে গেছে, কিন্তু এখনও সেই একই জায়গায় একইভাবে বেপরোয়ার মতন পড়ে আছে রীতা!

প্রচণ্ড বিরক্তি ভরে কাছে গিয়ে ধমকে উঠলো অসীত—হচ্ছে কী এটা? উঠতে হবে না?

মুখে জবাব না দিয়ে চারদিকে দুচোখ মেলে আলস্য ভরে হাত দুটো অসীতের দিকে তুলে ধরে তারপর রীতা ফিস্‌ফিসিয়ে উঠলো—তুলুন।

আপাদ মস্তক ঝি-ঝি করে উঠলো অসীতের যেন—শায়িতাকে তুলে ধরার কোন চেষ্টা করলো না।

বুঝতে পেরে বিশ্রস্তবাস সেরে নিজে থেকেই উঠে দাঁড়ালো রীতা হাতের চাড়ে বরতনুর বাঁক চুর—চড়াই—ওৎরাই গুলোকে ভদ্রতভাবে প্রকট করে।

বললো—জানি। হাত ধরে নামাতে পারে সবাই, তুলতে কেউ না।

উষ্ণ কণ্ঠে অসীত বলে উঠলো—যার হাত ধরে কদিন থেকে এমনভাবে নামা হচ্ছে, সেই রোভার তুলতে পারলো না? নাকি, তার বুঝি শুধু নামাবারই ভার?

উত্তরে রীতা ব্লাউজের ভেতর থেকে ক'খানা একশো টাকার নোট বার করে অসীতের নাকের সামনে নাচিয়ে আবার যথাস্থানে পুরে ফেললো।

—মানে?

প্রনামী। তবু তো এখনও দেবী প্রসন্ন হয়ে ভক্তকে আসল বরদান করেনি।

—ছিঃ!

কীসের ছিঃ? ফুসিয়ে উঠল রীতা—এখন এসেছেন ধমকে নীতিকথা শোনাতে? সারাদিন? মিষ্টি মুখের চোখের জল দেখে বুঝি বুঁদ হয়ে গিয়েছিলেন?

—রীতা! কী বলছো তুমি?

—ঠিকই বলছি। অতকথা কাল তবে কেন শোনালুম অমন

করে? বলিনি যে বধ করতে পেলে কাউকে আমি ছাড়বো না—কেন ছাড়বো শ'য়ে শ'য়ে টাকা? ঐ টাকার জন্যই তো সব! আর একটা কথাও শুনে রাখুন। লোকে দেখে, সবার সামনে আধা-উলংগ হয়ে অর্কেষট্রার তালে তালে—প্যাভিলিয়ানে আমি নেচে বেড়াই।

আমি জানি, আমি নাচি আধা নয়, পুরো উলংগীনি হয়ে,—হাজার হাজার মানুষের বুকের পাঁজড়া ভেঙে,—টাকার আওয়াজের মিষ্টি অরকেষট্রার সুরে—তালে মাতাল হয়ে। বেশ করি। আরও করবো।

দমকা একটা ঘুর্ণীর মতন চলে গেল রীতা।

সহসা মনে পড়ে গেল অসীতের একটা কথা লতিকা বলেছিল।

ষোস্‌ল রাশ!

মিলে গেল? এখানেও। কিন্তু......

তারপরের কথাগুলো মনে আসতে শিউরে উঠলো অসীত।

বারো

আশংকা সত্য হোল অসীতের। সেইদিন রাতেই!

রাত এখন অনেক। ছট্‌ফট্‌ করতে করতে সবারই চোখে একসময় থেমে এসেছিল ঘনঘোর।

সহসা রাত্রির সেই নিস্তব্ধতা খান্‌ খান্‌ করে মেয়েদের দিক থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে জেগে উঠলো একটা ভয়ার্তনাদ।

ঘুমঘোর ছুটে গেল সবারই। পড়ে গেল অজানা আতংকে ছুটোছুটি আর বিচিত্র কলরব। সেই অন্ধকারের মধ্যে কোথায় কী হয়েছে তাও প্রথমে ঠিক ধরা গেলনা।

লজ্জিত হয়ে পড়লো অসীত। ওর ওপরেই তখন ছিল পাহারা দেবার ভার। অথচ ঢুলনী এসেছিল ওর চোখে। কত ক্ষণের জন্যে, তা বুঝে উঠতে পারলো না। তাড়াতাড়ি কাটা ধুনির আগুনকে খুঁচিয়ে উজ্জলতর করতে করতে সে ছুটে গেল ডাকো-টামালার দিকে।

আর সেই মূহূর্তেই হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো খোলার ভিতর থেকে।

বিভাদেবীকে দুধার ধরে আছে রীতা আর লতিকা। উর্ধাংগে তাঁর কাপড় নেই। লুটোচ্ছে আঁচলটা। নিরাবরন বক্ষস্থল। শুভ্র তার সেই বক্ষস্থলে আর বাম গণ্ডে টাটকা ক্ষতচিহ্ন রক্তরেখা সেই ধুনির আগুনেতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেন কোনও বন্য হিংস্র জানোয়ারের নখ আর দাঁতের ক্ষুধার্ত আঁচল।

হাও হাও করে কেঁদে আকুল হচ্ছেন বিভাদেবী।

সভয় আতংকে সবাই সেই তিনটি নারীকে ঘিরে ধরলো চারদিক থেকে।

—কী হয়েছে?

রীতা জবাব দিল না। মুখ ফিরিয়ে নিল।

লতিকা ফুঁপিয়ে উঠলো—জানোয়ার, জানোয়ার!

—কী জানোয়ার? কোথায় গেল?

—জানিনা কোথায় গেল? মানুষ জানোয়ার।

—মানুষ?

চমকে উঠলো অসীত। মানুষ করেছে ঐ ভক্তিমতি প্রৌঢ়া বিধবার এই হাল! জবাব দিতে পারলো না ওরা কেউই। কোন মানুষ?

অন্ধকারে চিনতে পারেনি। ঘুমঘোর কামার্ত এক মানবের সেই বীভৎস আক্রমণে বিভাদেবী চিৎকার করে উঠার সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে সে পালিয়ে গেছে। তবে এটা ঠিক যে বাইরের লোক এমন নয়, এখন সে নিশ্চয়ই ওদেরই একজন কেউ।

কিন্তু কে সে? কে?...

একে একে সব ক'জন পুরুষের মুখের দিকে তাকালো অসীত। দেখলো সবার মুখেই সমান বিস্ময় আর আতংকের সুস্পষ্ট ছাপ।

একজন কেউ নিশ্চয়ই অভিনয় করছে। কিন্তু কে সে? কি করে ধরবে তাকে?

বিভাদেবী এখন পাগলের মতই হাও হাও করে কাঁদছেন, আর বুক-মাথা চাপড়ে মাটিতে আছাড়ি পিছাড়ি নাছেন।—আমায় তোমরা মেরে ফেলো গো, মেরে ফেলো! এই বয়েসে এমন করে আর আমাকে বাঁচিয়ে রেখোনা।

সামলাতে পারছেনা তাকে রীতা আর লতিকা।

সহসা আবার চমকে উঠলো অসীত।

তাই কি? কাল রাত থেকে ওরা পাশাপাশি শুচ্ছে তাই কি অন্ধকারে বিভাদেবীকে ভুল করে রীতা মনে করে...?

ঐ একই সন্দেহ যে একই সময়ে আর একজনের মনেও দেখা

দিয়েছিল, তা জানবে কি করে অসীত? জানতে পারলো এমনই যখন সহসা বিভাদেবীকে ছেড়ে দিয়ে গট্‌গটিয়ে রীতা গিয়ে দাঁড়াল রোভারের সামনে। তারপর অতর্কিতে ঠাস্ ঠাস্ করে সরোষে তার গালে বসিয়ে দিল ক'টা চড়।

চিৎকার করে উঠলো রোভার—হেই! হোয়াটিজ ইট? চিৎকার করে উঠলো রীতা—ইউ···ইউ! জানোয়ার। কিল্ হিম্! শেষ করে দিন একে।

তাই হয়তো দিতো সবাই রাগে আর উত্তেজনার আধিক্যে। পারলো না শুধু কেলিম্যানের জন্য। বুক দিয়ে আড়াল করে দাঁড়িয়ে টেনে হিচড়ে রোবারকে সে নিয়ে গেল অন্যদিকে। রোভার যাবে না কিছুতেই। সে তখন ক্ষেপে উঠেছে সত্যিই জানোয়ারের মতন। আপ্রাণ চেষ্টা করছে কেলিম্যানের কবলমুক্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। মুখে ছুটছে তার দুর্বোধ্য মাতৃভাষার স্রোত।

বাধা দিল অসীত।

বলক্ষয় বা লোকক্ষয়ের সময় এমন নয়। বাঁচে যদি, যদি আবার ফিরতে পারে লোকালয়ে, তখন এর বিচার হবে। এখন দল হালকা করা মানেই উদ্ধারের পথে আর একটা দুর্লঙ্ঘ প্রাচীর গড়েতোলা।

কিন্তু ছিছি করে ছেয়ে গেল তার সারা মন।

একি? মৃত্যুর ভ্রূকুটি সামনে নিয়ে এখন ও এসব প্রবৃত্তি আসে কোথা থেকে?

অথচ মৃত্যুর চেয়েও কি জারক—সুধা রাশি শক্তিমান? কিংবা হয়তো বিজন বনে বন্দী হয়ে সভ্য মানুষের মুখোশ-পালিশ খসে গিয়ে—সত্যি সত্যিই ওরা হয়ে উঠছে সেই আদিম বন্য জানোয়ার? মানুষ তাহলে "অমৃতস্য-পুত্র!" নয়?

বাকি রাতটুকু ওদের কাটলো বিনিদ্র চোখে।

পুরুষরা বিপর্যস্ত হোল রোভারকে সামলাতে, মেয়েরা বিভাদেবীকে নিয়ে।

তেরো

এলো আর একটা নতুন দিন।

সময়ের হিসাব রাখা এবার যেন অসাধ্য হয়ে উঠলো।

দরকার ও বোধ করলো না কেউ। সব যেন তেমন তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগলো। কী হচ্ছে আর কী হবে, তা যেন বৈরাগী হয়ে দাঁড়াতে চাইল। বিরাট একটা অবসাদ, বামুনে হাঁ করে ওদের গিলে ফেলবার জন্য যেন ওৎ পেতে আছে। গত রাতের কদর্য দুর্ঘটনায় ফলে আরো যেন অসাড় হয়ে এসেছে সবার চেতনা।

বিভাদেবী আজ আর উঠে বসলেন না। শুয়ে শুয়েই রইলেন, মালাটা হাতে করে। দুচোখে বহে চললো তার অঝোর ধারা! যেন মানুষের কদাকারের জন্যে কেঁদে নালিশ জানাচ্ছেন তিনি অদৃশ্য নিয়ন্তার কাছে।

রীতা জামাকাপড় পালটালো ঠিকই। রঙ কলোটা দেখা গেল না। হয়তো অভাবে। হয়তো অনিচ্ছা তার অবসাদে। চারদিকে শুধু হতাশা আর নিরাশা।

আহার্য ফুরিয়ে গেছে। পানীয়ও, অথচ অত কিছুর মধ্যেও তৃষ্ণার অনুভূতি সবারই বেড়ে উঠেছে অসহনীয় হয়ে। চোখের সামনে বিভীষিকা যেন মূর্তি ধরে তাণ্ডব নাচছে। সুমতীদেবীর অবস্থা দাঁড়িয়েছে আরও শোচনীয়। বুঝি আর বাঁচানো যায় না।

বলতে সাহস হচ্ছিল না অসীতের। তবু সে ডাকলো পুরুষদের! বললো—যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ চেষ্টা করতেই হবে। বেশিদূরে যাওয়া উচিত হবে না। হিংস্র জন্তু জানোয়ার থাকতে পারে। তবে দু'দলে ভাগ হয়ে এখন থেকে আমাদের জংগলের মধ্যে কাছাকাছি হানা দিতেই হবে আহার্য আর পানীয়ের সন্ধানে। কথা বললো না কেউ।

গদাধরকে দলে টানা যায় না। তাই একজনে রইল কেলিম্যান,

রোভার আর রনজিৎ সিং। অন্যদলে শুধু অসীত আর নন্দ গোস্বামী।

রীতা, লতিকা আর গদাধরকে সাবধানে থাকতে বলে ওরা বার হয়ে পড়লো। দু'দলে রইল দুটো রিভলবার। অসীত আর কেলিম্যানের কাছে।

যাবার সময় রোভার গিয়ে একটু বিভ্রাট দেখা দিল। তার থেকেই কেমন যেন নিঝ্ঝুম্ মেরে মাথা নিচু করে হাসছিল। অসীত ভেবেছিল হয়তে লজ্জায় আর অনুতাপে। বেলা বাড়ার সংগে সংগে কিন্তু দেখা গেল সে অবাক মনেই বিড়বিড় করে কী সব বকছে। চেষ্টা করে কেলিম্যান ও তার কোন ও মাথামুণ্ডু ধরতে পারেনি।

এখন যাবার সময়ে তাকে তেমনই দায় হলো। যেতে যায় না, অথবা কী জন্য কোথায় যেতে হবে তাও যেন বুঝতে পারছে না।

রনজিৎসিং গর্জে উঠলো-ন্যাকামী ধরেছে! দেবো ক'টা রদ্দা?

বাধা ছিল কেলিম্যান। সে-ই একরকম টানতে টানতে সংগে নিয়ে গেল রোভারকে।

বৃথা পরিশ্রম। শূন্য হাতে দুপুর বেলায় ফিরে এলো অসীত আর নন্দগোস্বামী। ফিরে দেখলো, অন্যদল আগেই ফিরে এসেছে। জানার হদিশ তারাও পায়নি। তবু আনন্দে তারা উদ্বেল হয়ে আছে। পেয়েছে তিন—তিনটে বেলে আনারস। কাঁটা কিন্তু বড় বড়।

খেতে গিয়ে দেখা গেল দারুণ টক আর তেমনি কুটকুটে। তবু তাই তখন অমৃত ওদের কাছে। পেটে ভার পড়লো। গলাটা ভিজে আয়াস পেলো।

খেল না শুধু বিভাদেবী। পায়ে ধরে কাকুতি জানালো রীতা তবুও না।

রীতা বললো—এতো গাছের ফল। এতে দোষ কী?

—জানি কিন্তু আমাকে আর এরপর খেতে বলো না।

—মরে যাবে যে ?

—তবে মরে যাবে যে—

—আমি তাই চাই। আমাকে ছেড়ে দে রীতা—ছেড়ে দে তুই আমাকে।

বাধ্যহয়ে চুপ করে রীতা। সকলে তারপর শুয়ে পড়ল গাছের ছায়ায় বিশ্রামের আশায়।

বেলা যত বাড়তে লাগল, ততই সে রোভারেব উপসর্গ বেড়ে বলতে লাগল। কেলিম্যান ঘুমিয়ে পড়লে রোভার উঠে গিয়ে নিজে রোদে বসল। কেউ কিছু বললে না তাকে—আর।

একা রোভার দলহারা। আপন মনে যে বিড় বিড় করে কিসব বলে চলেছে। এখন তাকে—বললো মোরে।

কখনো চীৎকার করছে—কখনো বিড় বিড় করে কীজানো বকছে।

অসীত চুপ করে যায়। তারা তারপরে কিছু করায় সেই।

তারা কি কালি।

সূর্য পশ্চিম আকাশে।

গাভীর দল খোশ ভাবে বসে আছে। বাঁকা পথ কোঠরে হবে।

হঠাৎ একসময় রোভার উঠে দাঁড়াল? ছুটল যত জোরে জঙ্গলের দিকে।

অসীত দেখে দূর থেকে পেছনে পেছনে ছুটতে ছুটতে যায়।

ডাক দেয়—মিঃ রোভার। শুনুন।

কেলিম্যান উঠে বসে রোভারকে যেতে দেখে সে ? ছুটে এল।

কিছু রোভার গভীর জঙ্গলের মধ্যে ছুটে গেল তার পিছনে কেউ অনুসরণ করতে পারল না।

অসীত ফিরে তবে হতাশভাবে বললে—এখুনি রাত নামবে। কোথাও পাবে না ওকে ? বাঘ ভালুকের পেটে যাবে।

বিভাদেবী হঠাৎ মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে খুশীর সুরে বললেন—বেশ হয়েছে। খুব ভাল হয়েছে। আমার উপরে সাধারণ আদেশ-চন্দ্রসূর্য উঠছে। যেমন বাঘ ভালুকের মত চরিত্র, তেমনি বাঘের পেটে গেল।

কিন্তু তাঁর নন্দী গোস্বামী বললেন—ভগবান, তুমি ও কি করলে উঃ, কে এত সিন্দুর দিল তুমি দয়াময়?

পাশাপাশি মানুষের মনের দুটি বিপরীত প্রকাশ তখন সামির কে জাবে, কে কাঁদে।

সূর্য ডুবে গেল—কিন্তু রোভার আর ফিরে আসেনা।

একটু পরে দেখা গেল দূরে থেকে ফিরে আসবে রণজিৎসিং-লতিকা।

দুজনের মধ্যে খুব তর্ক হচ্ছিল। রণজিৎসিং এসে অসীতকে বললে—তুমি সবার উপরে হুকুম করলে, কিন্তু তুমি হনিশের লোক হয়ে কিনা শেষে সরোজলালকে পালাতে দিলে কেন? জান না যে কেলিম্যান। তাকে ধরতেই ত আসি আমি দিনে।

অসীত বললে—জানি, কিন্তু কে জানিবে না। কিরে আসবে।

—তোমার মাথা আসবে। মাঝখান থেকে আমাদের জীবন নষ্ট হলো। ঐ খাবারগুলো যেখানে তার? হদিস আমরা যেতে পেতাম।

অসীত বললে—আমি জাতি, খৃষ্টান সরোজলাল ক্রিমিন্যাল, স্মাগলার। কিন্তু তবু যে পারবে না। কারণ দু বছর যেন খাতে যে পারবে—তার চোর তাকেই বড় একটা জিনিষ যে তখন রেখে গেছে।

—কি সেটা?

—তুমি জান না?

—মাজি, লতিকা তার মেয়ে। মাদ্রাজী এর ছদ্মনাম। আসল নাম লতিকা মারাঠে।

—তবে ঐ বোস।

লতিকা লজ্জায় মাথা নীচু করে রইল।

অসীত বললে—আমি সব জানি। কিন্তু তোমার মত চ্যাঁচাই নি সিং জী। আমি জানি তুমি এককালে তিন লাখ টাকা চিটিং করে জেল খেটেছ জান। সেই টাকা খাটিয়েই তুমি আজ দুটো পয়সা করেছ—তাই না সিংজী?

রণজিৎ সিং কোন উত্তর দিল না।

অসীত আবছা দৃষ্টিতে লতিকার দিকে চেয়ে বলল—আপনি কিছু মনে করবেন না লতিকা দেবী—

এরবেশি আর কিছু বললে না সে। সবাই হতবাক হয়ে শুনছিল অসীতের কথা। কারও মুখ দিয়ে বাক্যস্ফুরণ হলো না।

চৌদ্দ

সন্ধ্যা নেমেছে।

আকাশে তারার মালা। একটু দূরে একা চুপ করে বসেছিল অসীত।

ভাবছিল নানা কথা।

শোনা গেল পায়ের শব্দ।

মুখ তুলে তাকাল অসীত। দেখল তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে একটি নারী।

অসীত বলল—আসুন লতিকা দেবী।

লতিকা এসে পাশে বসল।

—কিছু বলবেন?

—হ্যাঁ।

—বলুন।

—আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি অসীতবাবু।

—জানি। আচ্ছা একটা কথা। আপনি যে সরোজলালের মেয়ে তা রণজিৎ সিং জানল কেমন করে?

—আমিই ওকে বলেছিলাম।

—সেই সুযোগে ও আপনার অপমান করল।

—হ্যাঁ। কারণ আমি তাকে অস্বীকার করেছি কিনা।

—অস্বীকার করেছেন।

—হ্যাঁ। যে লতিকা মারাঠেকে লতিকা সিং বানাতে চেয়েছিল। তার একটা কথা—

—বলুন।

—আমাকে চাওয়ার পর আমাকে আর আপনি বলবেন না। বলবেন তুমি।

—আমি তোমার বাবাকে ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, তাই বুঝি তোমার বিষ নজরে পড়েছিলাম।

হ্যাঁ।

—তুমি এই ভেবে যাচ্ছিলে কেন ?

—বাবার কাছাকাছি থাকবো কেন ?

—তার জন্য এত লুকোচুরি ?

—ভেবেছিলাম এমন কথাটা কেউ টের পেতে পারে—তাই লুকিয়ে থাকতে চেয়েছিলাম।

খাবে চলো অসীত খুশী হলো।

লতিকা বললে—আমি যে তা তুমি জানলে কি করে ?

—তোমার বাবার সাথে তোমার চেহারার মিল দেখে। আচ্ছা একটা কথা—

—কি ?

—তুমি বিবাহ করোনি ?

—করেছিলাম।

—তিনি এখন নেই ?

—না।

—তাই বুঝি স্বামীর পয়সা ব্যবহার করো না ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা। তিনি এখন কোথায় ?

—তাঁর সাথে ডাইভোর্স হয়ে গেছে।

—কেন ?

—বিয়ের রাতেই স্বামী আমাকে ত্যাগ করে চলে যান (আমি) আর তাঁর কোনও খবর নিইনি। তিনি আমাকে ডাইভোর্স করে আবার বিয়ে করেন। তাই আমি আজ ও কুমারীই আছি।

—বিয়ের রাতে ত্যাগ করলো কেন ?

—কারণ তাঁর ধারণা ছিল না যে আমার মা বাবার বিবাহিতা পত্নী নয়।

—তাই নাকি ?

হেসে উঠল অসীত।

—হাসলেন কেন ?

—কারণ এত ছোট বা সামান্য কারণে কোনও স্বামী যে আজকের দিনে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে তা আমার জানা ছিল না।

—সবাই ত আপনার মতো উদার নয়।

—তা বটে।

বলে অসীত আবার হেসে উঠল।

লতিকা পথের দিকে চেয়ে রইল এতকাল।

পনেরো

হেলিকপটার উড়ে এলো এদের মাথার উপরে পরদিন সকালে।

গর্জন করতে করতে নেমে এলো উপর থেকে ঐ ফাঁকা জায়গাটার মধ্যে।

বোকার মতো তাকিয়ে রইল ওরা। সত্য দৈত্যটাকে বিশ্বাস হচ্ছিল না।

দরজা খুলে বেরিয়ে এলো প্রথমে ড্রাইভার—আর তার পরেই তারা জানাল।

লতিকা ছুটে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরল। সে বেরিয়ে এলো তাই অসীতের কাছে।

অসীত বললে—যাক্, ঠিক কাজের মত কাজ আপনি করেছেন।

সুরজলাল বললে—মিথ্যা সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই। একবারে সব যাবে না—দুবারে যেতে হবে।

হেলিকপটার থেকে খাদ্য পাচার বের করে দিল পাইলট। বললে—শিগ্‌গীর সেরে নিন আপনারা।

প্রথম ট্রিপে সবাই একে একে উঠতে লাগল।

লতিকা দাঁড়িয়েছিল না ওঠার জন্যে তার দিকে তাকাল রণজিৎ সিং।

লতিকা বললে—মিঃ সিং, তুমি সরে পড়ো ওঁদের সঙ্গে। কি জানি, ফিরতি পথ যদি না হয়?

রণজিৎ সিং একটু ভেবে নিয়ে উঠে পড়ল ঐ হেলিকপটারে।

পাইলট বললে—আর মাত্র দু জন।

বলতে না বলতেই এগিয়ে এলো রীতা। আশ্চর্য, এর মধ্যেই যে কখন চোখ মুখ সব রঙ করে ফিরে আসা—পরিণী উঠেছে।

অসীত বললে—তুমি যাবে?

—থাকবো কোন অধিকারে? নিজের ভাগ্য নিজে তৈরী করতে চেয়েছিলাম—তাই ঘর জীবনে পেলাম না। শুধু পেলাম নাচঘর, সাজঘর, জল্‌সাঘর আর অভিনয় ঘর। তাই—

—এখন কোথায় যাবে?

—সিং জী দেখবেন ফিরে যাবেই।

—মানে?

—মানে লোকটার অনেক টাকা। আপনি নামল হীরতাটাও কেরে মিলেন, তাই উঠি কাঁচ ফিরে তুষ্ট থাকতে চান।

হাসতে লাগল রীতা।

অসীত দেখল, সেটা যেন আমি নয়, গুম্‌রে ওঠা কান্না।

—উইশ ইওর গুড্ লাক্!

—ও, কে।

হাসতে হাস্‌তে গিয়ে উঠল নৃত্য পটিয়সী রীতা।

সবার শেষে গেল গোস্বামী।

অসীত বললে—তুমি ওখানে যাও নি?

—একটা কথা না বলে যে যেতে পারছিলাম না আমি।

—কী কথা বল।

—সে রাতের ব্যাপারে দায়ী কিন্তু সত্যিই রোভার নয়—

—তবে কে?

—আমি!

—তুমি? তুমি সন্ন্যাসী—তুমিই রীতাকে—

—বিশ্বামিত্রের মত সন্ন্যাসীদের চেয়ে বড় ত আমি নই।

আর কথা বললো না। গোস্বামী গিয়ে উঠল হেলিকপ্‌টারে।

সে ছেড়ে দিল গাড়ী।

বোকার মত তাকিয়ে রইল অসীত।

এবারে বসেছিল সাত বার হত গাছের ছায়ায়।

অসীত, কেলিম্যান, সরোজলাল আর লতিকা।

এরা ক'জন চলে গেছে। হেলিকপ্টার ফিরে এলেই ওরা যাবে। আর তা ফিরে আসবেই তা এরা জানে।

গুম্ মনে বসে ছিল সংগীহীন কেলিম্যান কি বলবে সে দেশে ফিরে গিয়ে রোভারের আত্মার কবরে? বার বার তার মনে পড়ে রোভারের কথা। কেলিম্যান দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

অসীত সরোজলালকে বললে—পথে কি খুব কষ্ট হয়েছিল?

-- যা হওয়া স্বাভাবিক—তার বেশী কিছু হয়নি।

—হয়তো তোমার ভবিষ্যতের সানিধ্য তখনি সহজ হয়ে আসবে।

—আমি তার কথা ভাবিই না।

— কেন?

--কয়েক বার জেল হবে বড় জোর। শুধু সাহস তাকে যে একমনে ভিতরে নিশ্চিন্ত করেছি।

কার কথা বলছো?

আমার মেয়ে লতিকার কথা এর ভার দিয়ে যাব সত্যিকারের সাধুদের হাতে।

লতিকা তাকাল অসীতের দিকে।

তারপর লজ্জায় তার থর থর ডাগর চোখ নেমে এলো নিচে।

অসীতের চোখে একই ভাষা।

চোখে চোখে মিলন হলো।

চোখ নামালে দুজনেই।

লতিকা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল।

অসীত ভাবতে লাগল—আধুনিকা মেয়ের এত লজ্জা?

শেষ